হিরে ও ভিখারিনি সুন্দরী রমণী কিস্‌সা

হিরে ও ভিখারিনি সুন্দরী রমণী কিস্‌সা

শতাব্দী
৬, বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রিট, কলিকাতা-১২

প্রথম প্রকাশ

১লা শ্রাবণ, ১৩৬৫

: প্রকাশক :

প্রবীরকুমার সেন

১।৩এ, পরমহংস দেব রোড

কলিকাতা-২৭

: প্রচ্ছদ :

দেবব্রত মুখোপাধ্যায়

: বর্ণলিপি :

গণেশ বসু

: মুদ্রক :

জয়গোবিন্দ পাল

যোগমায়া প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

১, রাজেন্দ্র দেব রোড

কলিকাতা-৭

হিরে ও ভিখারিনি সুন্দরী রমণী কিস্‌সা

১. জ্যোৎস্নায় মায়ায়।

রাত সাড়ে দশটায় সাহিল তার ম্যানেজারের সঙ্গে ফিরছিল বাড়ি। নিশার মোটরসাইকেল চালাচ্ছিল, আর সাহিল পেছনে বসে। চন্দ্রালোকিত রাত। এক স্বপ্নের ভিতর যেন তাদের যাত্রা। বাগনান স্টেশন শহর থেকে কড়িয়া ফকিরপাড়া তাদের গন্তব্য। ন-কিলোমিটার পথ। জ্যোৎস্নালোকের ভিতর, আর এই ঘন হয়ে ওঠা রাত, তার ভিতর এই যে নির্জন রাস্তায় যাত্রা, তাতে যেন সাহিল কোনো মায়াবী জগতে প্রবেশ করে ফেলেছে। অনেক কিছুই অচেনা মনে হয়। দুপাশে ধানখেতের দৌড়। হেমন্তকাল চলছে। শিরশিরে এক ঠাণ্ডা বোধ। সে জানে, মৃদু এক শিশিরপাতের ভিতর তারা আছে। আর দুপাশে খেত জুড়ে ফসলের সমারোহ।

সাহিল যেন অন্য দেশ, অন্য কোনো প্রান্তর দিয়ে যাত্রা করছে, অনেক কিছুই তার অচেনা মনে হচ্ছে, এইটুকু পথ তো প্রতিদিন এভাবেই যাত্রা করে সে। কেন না বাগনান স্টেশন শহরে তার ব্যাবসাক্ষেত্র। ব্যাবসা সেরে প্রতিদিনই এভাবে কড়িয়া ফকিরপাড়াতে ফেরে সে। খুব সফল ব্যবসায়ী সে, অল্প বছরের মধ্যেই টাকা পয়সা করেছে যথেষ্ট, ধনী হয়েছে।

আজ কেন যে তার মনটা এমন হল বুঝে উঠতে পারছে না। বাস্তব মতি হারিয়ে ফেলছে। যেন সহসা কোনো কল্পমিলনে সে চলে যাচ্ছে, মাঠ প্রান্তর অচেনা মনে হচ্ছে। গাছপালা রাস্তার মোড়, দোকানপশারির সঙ্গে যেন তার অপরিচয়।

নিশারকে থামিয়ে একটু দাঁড়িয়ে পড়বে কিনা ভাবল। কিন্তু দাঁড়িয়ে পড়বার জন্য যে তাকে বলতে হবে, উদ্যোগ নিতে হবে, সে উদ্যোগে সে যেতে চাইল না।

বছর বেয়াল্লিশ বয়েস তার। শরীর স্বাস্থ্য ভালোই। প্রাণবন্ততার অভাব এখনও পর্যন্ত কখনো বোধ করেনি। চমৎকার থাকে, সুন্দর থাকে। ব্যাবসার সব ঝামেলা সামলায় নিশার। তার কেন যে এই আজ এই মুহূর্তে মন খোয়া যাওয়ার বোধ এসেছে, তার কোনো কার্যকারণ খুঁজে পাচ্ছে না সাহিল। নিজেকে ভুলে যাচ্ছে, নিজের অস্তিত্ব ভুলে যাচ্ছে, আত্মপরিচয়ও তার খোয়া যাচ্ছে। তার গন্তব্যও ভুলে গিয়েছে।

মোটরসাইকেল জোরেই চালাতে অভ্যস্ত নিশার। আর এই চাঁদের আলোর ভিতর চালানোর আনন্দই আলাদা। কিন্তু সাহেবকে কোনো কথা বলতে না শুনে একটু অবাক হল। সাহিলকে সম্মান জানিয়ে 'সাহেব' বলে ডাকে সে। এতে সাহিল খুশি।

নিশার সাহিলের চেয়ে বছর দুয়েকের ছোটো। বাগনানে বাড়ি। বাগনানেই থাকে। সাহিলকে প্রতিদিন রাতে ফকিরপাড়ায় ফিরিয়ে দিয়ে যায় নিশার। সকালে নিতেও আসে। কেন না মোটরসাইকেলে ভয় সাহিলের,—চালানোতে। সাইকেলটি পর্যন্ত চালাতে পারে না সাহিল। ব্যাবসার সবকিছু দেখাশোনার সঙ্গে সাহিলের ছায়াসঙ্গীও নিশার। অদ্ভুত দোস্তিও তাদের। অনেক সময় সাহিল নিশারের সঙ্গে এমন ব্যবহার করে, তাতে নিশার ভুলে যায় সে কর্মচারী। প্রাণবন্ত মানুষ। নীচতা জানে না। আর লোকটাকে খুশনশিবি করেছে আল্লা। প্রচুর টাকার মালিক হয়ে উঠছে। ব্যাবসা রমরমিয়ে চলছে।

সমস্ত পেটের কথা নিশারকে না বলে পারে না। আর নিশার সৎ পরামর্শ দিতেই জানে। তারও কোনো নীচতা নেই।

কিন্তু কী হল সাহিলের আজ, এই মুহূর্তে, তার এমন মায়াবী লাগে কেন সবকিছু? কোথাও কিছু একটা ঘটেছে, শরীরে অথবা মনে। মন বোধহয় অন্য কোথাও খোয়া যাচ্ছে। শেষ পর্যন্ত কি আজ পৌঁছতে পারবে নিজের বাড়িতে? নিজের বউ-ছেলেমেয়েদের কাছে?

নিশার ভাবছিল, বাড়ি ফিরতে ফিরতে মালিক কেন এত নীরব। সবই তো ঠিক আছে। কোনো কথা বলছে না কেন? কেন, তবে কি কোনো গোপন কথা তার কাছে লুকোচ্ছে? একবার একটা গোপন কথা লুকিয়ে কষ্ট পাচ্ছিল সাহিল, বলে ফেলতেই কষ্ট দূর হয়েছিল। বছর খানেক আগে কোনো এক বিয়েবাড়িতে, কোনো এক অল্পবয়সী মেয়েকে দেখে ভালো লেগেছিল। বিষয়টা বেশি দূর গড়াতে পারেনি। কেন না সেই অল্পবয়সী মেয়েটা দূর সম্পর্কে সাহিলের ভাগ্নি ছিল। কোনো কিছু এগোনোর উপায় ছিল না। এমন নিষেধ এসে দাঁড়িয়েছিল যে নিশারের হাত-পা বাঁধা।

বোধ হয় অনেকদিন পর্যন্ত মনকষ্টে ছিল সাহিল। আর এই এত ব্যাবসাপাতি ধন-দৌলত হওয়ার জন্য, লোকটাকে মাঝে মাঝে মনমরা দেখে নিশারের মাঝে মাঝেই মনে হয় মালিক আর একটা বিয়ে করলেই পারে। বেশ অল্পবয়সী আর একটা বউ হত, বেশ মন ভালো লাগত মালিকের। কেন মনে হয়, বলতে পারবে না নিশার। তবে লোকটাকে দেখলে একথাই বেশি মনে হয়। কত গোপন কথা বলে তারা, কিন্তু একথা তারা বলতে পারে না। কর্মচারী হয়ে আগবাড়িয়ে একথা বলার সাহস পায় না কোনোদিন। আর মালিকের মনমরা অবস্থা সয়, সয়ই; চুপ করে সয়।

আজও তেমনটা দেখছে মালিককে। মোটর সাইকেলে চড়ে চুপ করে গেছে। কোথাও খোয়া যায় যেন।

সাহিল নিজেই নিজের এই আসা যাওয়ার কারণ খোঁজার চেষ্টা করল। তার

বাড়িতে বেড়াতে আসা তারই ছোটো শালিকে গতকাল ঘুমন্ত অবস্থায় মুখে মুখ নামিয়ে চুমু খেয়ে ফেলেছিল। তার ছোটো শালি টের পায়নি, ঘুমিয়েই ছিল। তবুও কেমন এক অপরাধবোধে ভুগেছে সাহিল। অন্যায় করেছে, তার জন্য মনখারাপ হয়েছে। একথা নিশারকে পর্যন্ত বলতে পারেনি। তার জন্যই কি এই যাত্রাটা তার কাছে এমন মায়াবী হয়ে উঠেছে? বলতে পারবে না, সে এ বিষয়ে বিশেষ কিছু জানে না। সবই ঠিক ঠাক ছিল, মোটরসাইকেলে চড়ার কিছুক্ষণ পরই এই বোধ এল তার।

পাড়ার কাছেই চলে এসেছিল। একটা বাঁকের পরই ফকিরপাড়া। তার আগে রাস্তা লাগোয়া একটু বসবাস। এখানে কিছুটা সরকারি খাস জমি ছিল, বছর কুড়ি আগে কিছু গরিব মানুষদের মধ্যে পাট্টা বিলি করে বসতির পত্তনি হয়েছে। এখানে একটা জায়গা এসে হঠাৎ নিশারকে থামতে বলে সাহিল।

নিশার মোটর সাইকেল থামায়। ততক্ষণে সাহিল নিশারের পিঠে মাথা ঠেকিয়ে দিয়েছে। আর নিশার মোটরসাইকেলের স্টার্ট বন্ধ করে, মোটর সাইকেল থেকে নেমেছে, মোটর সাইকেল স্ট্যান্ড করেছে, যেই মালিককে ধরেছে, তখনই মালিক অচৈতন্য, অজ্ঞান। এরকম কোনোদিন হয়নি। কিন্তু তার হাতে মালিক অচৈতন্য হওয়ায় নিশার কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়, কিছুটা সময়ের জন্য হলেও। তারপর ধরে ধরে সাহিলকে নামায় জ্যোৎস্নায়, রাস্তায়। সামনের ঘর থেকে অল্প সরু আলোর রেখা আসছিল। গরিব মানুষদের একটা টালিছাওয়া ছোটো মাটির ঘর। মালিককে রাস্তায় শুইয়ে দিয়ে চকিতে সেই ঘরের দরজায় পৌঁছে যায় নিশার। একটা কাঠের দরজা, করাঘাত করে। 'একবার দরজাটা খুলুন না, একজন মানুষ অসুস্থ হয়ে পড়েছে।'

অল্প সময় পরে দরজাটা খুলে গেল। এক বৃদ্ধা দরজার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। ঘরের ভিতর অল্প আলো, তার মধ্যে আরও কেউ একজন আছে, বোঝা গেল, কিন্তু দ্বিতীয় ব্যক্তির প্রকাশ্যে আসতে না চাওয়া।

বৃদ্ধা মুখের অভিব্যক্তি দিয়ে বুঝতে চাইল, কী হয়েছে?

নিশার বলল, 'একজন মানুষ অসুস্থ হয়েছে।'

বৃদ্ধা বলল, 'এই তো এখানে বিছানায় নিয়ে এসো এখুনি।'

'আমি একা'—

'ও চলো, আমি হাত লাগাচ্ছি।' বেরিয়ে আসে বৃদ্ধা।

ধরাধরি করে কোনোরকমে এই ঘরের বিছানায় সাহিলকে শুইয়ে দিল তারা। ঘরের অল্প আলোয়, ঘরের দ্বিতীয় ব্যক্তি ছায়ার দিকে সরে গিয়ে প্রায় মুখ আড়াল করে লুকিয়ে থাকে। তার সঙ্গে দেখা করার কিছু নেই নিশারের। কোনো মেয়েলোক, মেয়েলোকই হবে। এখন তাকে ডাক্তার ডেকে আনতে হবে, এখনই। মালিকের বোধ হয় গুরুতর কিছু হয়েছে।

২. তিনটি চুম্বন

কোথায় আছে, কীভাবে আছে, কিছুই জানে না সাহিল। সে যেন এক অন্ধকারের মধ্যে আছে। তার স্বচ্ছ কোনো চৈতন্য নেই। বুঝতে পারল সে শুয়ে আছে, আর বোধহয় বিছানায়। চারপাশে অন্ধকারের ঘেরাটোপ। এভাবে আছে, এভাবে থাকা ছাড়া উপায় নেই যেন তার। আর সে যে ঘরে আছে, সেখানে অন্য কোনো দু-একজন ব্যক্তি আছে। তারা কে কে ও কারা কিছুই জানে না সে। জানবার মতো চৈতন্য নেই তার। তারা বোধহয় তার কাছ থেকে অনেকটা দূরে থাকে। তাদের সঙ্গে কথা বলা ব্যবহারে যাওয়ার মতো সুস্থতায় নেই সে। শুধু মনে থাকে সে আছে। আছে মানে, কোথাও একটা আছে।

ঘরের ভিতর অন্তত দুজন ব্যক্তি বোধহয় কথা বলে, নানা ব্যবহার ভঙ্গিতে যায়, যা সে ধরতে পারে না। কথা বললে বোধহয় খুব আস্তে কথা বলে। যা তার পক্ষে শোনা সম্ভব নয়। একটা আভাসের অনুমান পায় সে। রহস্যময়তার এক মায়ালোক তার চারপাশে জড়িয়ে থাকে, যা সে ছিন্ন করতে পারে না, ছিন্ন করতে বোধহয় চায়ও না সে।

মানুষ এত আস্তে কথা বলে কেন? কেনই বা এত নিস্তব্ধতা? কেনই বা এত আলোকহীনতা? কেনই বা সে অচৈতন্যদশায় পড়ে আছে? এই দশা থেকে বেরিয়ে আসতে সে যে খুব একটা চেষ্টা করছে, তা নয়। এই দশায় থাকতে তার বোধ হয় ভালো লাগছে, ভালোবেসে ফেলছে।

শব্দও হয় না ঘরের ভিতর। কেউ কিছু রাখার শব্দ তোলে না। অথচ ঘরের মধ্যে মানুষ আছে, একজন মানুষ, দুজন। আর মনে করতে ভালো লাগছে, তারা দুজনেই মেয়েমানুষ।

কপালে অবিরত হাত বুলিয়ে চলেছে কোনো নরম হাতের আঙুল, এই অনুভব হঠাৎ জেগে উঠল সাহিলের। এবং এই স্পর্শ তার ভালো লাগছে। এই যত্নস্পর্শ তার শরীর আর আত্মা পর্যন্ত আতত হয়ে পড়ছে। কে তার কপালে হাত বুলোচ্ছে, জেগে উঠে চোখ মেলে তাকিয়ে দেখার শক্তি নেই সাহিলের। তার কপালে হাত বুলিয়ে দেওয়ার ভঙ্গিটা বুঝতে পারে না। কিন্তু এটুকু অনুমান করতে পারে, যে তার কপালে হাত বুলোচ্ছে, সে তার মাথার কাছে বসে আছে। এই শিয়রে বসে থাকার ঘনিষ্ঠতার যত্ন একভাবে বোঝে সে।

এই অঙ্গুলি স্পর্শে শরীরে ও মনে আরাম পায় সাহিল। মন ও শরীর ভরে ওঠে। সে কি নিজের বাড়ির বিছানায় আছে, আর তার শিয়রের পাশে অন্য এক নারী এসেছে, সে চেনে না, কিন্তু তার এই সেবা ও যত্নস্পর্শ তার ভালো লাগে। এর মানে তো সে তার বিবি-অতিরিক্ত কোনো এক অন্য রমণীর যত্ন সেবার আকাঙ্ক্ষায় বাসনাসিক্ত হয়ে আছে। আর এই মায়ালোক বোধহয় তার বাসনার জন্ম দিয়েছে। এই রমণীও তার প্রতি অনুরক্ত হয়েছে।

কপালে সেই রমণীর করাঙ্গুলির স্পর্শ তো পায়। এখন দিন না রাত, কিছুই জানে না। সেই রমণীর শরীরের গন্ধ পায়, কিন্তু কিছুতেই রমণীকে স্পর্শ করার শক্তি যোগায় না শরীরে। চোখ মেলে তাকানোর শক্তি নেই তার। একটা মায়ালোক। একটা আবছা অন্ধকারের জগৎ তার চারপাশে। আর নিস্তব্ধতা চারপাশে। আর সেই নিস্তব্ধতার ভিতর কারা দুজন রমণী কথা বলে। আর তাদের মধ্যে একজন তার শিয়রে বসে, তারই কপালে করাঙ্গুলির স্পর্শ দিয়ে যায় নিরবচ্ছিন্ন। কোথাও তার প্রতি যত্ন আর প্রেমার্তি আছে, তার এই ভঙ্গির ভিতর একথা সে প্রমাণ করে, একথা সে প্রগাঢ় করে। আর এই ব্যবহারের বিপরীতে সাহিলও ভালোবাসে তাকে, ভালোবেসে চলে এসেছে যেন কতকাল, যুগ-যুগান্ত ধরে।

অন্য রমণীর সঙ্গে সে যেন কিছু বাক্য-বিনিময় করে চলেছে অথচ কী কথা বলছে তার বিন্দু-বিসর্গ ধরতে পারছে না সাহিল। সে তেমনই মায়ালোকে আছে, কিন্তু কিছু বুঝতে পারছে।

তার সঙ্গে নিশার ছিল। কিন্তু কোথায় গেল? তাকে ফেলে যেন পালিয়েছে। কিংবা এই রমণীর কাছে রেখে নিশ্চিন্ত মনে কোথাও ফিরে গেছে। হয়তো কোনো এক সময়ে নিতে আসবে। এখন সে তার কাঙ্ক্ষিত রমণীর আশ্রয় যত্নে আছে।

তার হয়তো কিছু একটা হয়েছিল। কিছু একটা অসুস্থতা। এখনও বোধহয় সে অসুস্থ। তার সুস্থতা ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য তাকে যেন নিয়ে যাওয়া হয়েছে কাঙ্ক্ষিত নারীর কাছে। যেখানে সেই নারীর সে সঙ্গযত্ন পাচ্ছে। সুধার সময় ভরে আছে এখানে। বেশ ক্লান্তিহীন মায়ালোক।

তাকে যেন সেই রমণী চুমু খেল। ঠোঁটে ঠোঁটের স্পর্শ পেল সাহিল। রমণীটি স্বেচ্ছায় চুমু খেয়েছে। চুম্বন করার জন্য মুখ নামিয়েছে তার মুখের দিকে। আর ঠোঁটে ঠোঁট লাগিয়ে চুমু খেয়েছে নির্দ্বিধায়। মনে করতে পারল এই চুম্বনে স্বতঃস্ফূর্ততা আছে। আর কি আশ্চর্য আর একটা চুম্বন করল। নিশ্চিত আর একটা অন্তত চুম্বন করবে, কেন না তিনটির প্রতি লোভ থাকা সমীচীন, লৌকিকও। আর তৃতীয় চুম্বনের মুহূর্তের একটু আগেই সাহিল চেষ্টা করল চোখ মেলে তাকানোর। প্রথমেই চেষ্টা ব্যর্থ হল, চেষ্টা আরও গাঢ় করতে যে মুহূর্তে চোখ মেলল সেই মুহূর্তেই রমণীর ঠোঁট মিলিত হল সাহিলের ঠোঁটে। কি অপূর্ব আস্বাদ! আর রমণী অপরূপ সুন্দরী! মুখে হাসি, চোখে কামনা, প্রেম।

বেশিক্ষণ তাকাতে পারেনি সাহিল। পরমুহূর্তেই তার চোখের পাতা নেমে আসে। আবার সে তার আচ্ছন্নদশায় ফিরে যায়। তখনও করাঙ্গুলির স্পর্শ দিয়ে চলছিল রমণী। এক অবাস্তব অলৌকিকতার জগতের মধ্যে চলে যাচ্ছিল সে, ইচ্ছা-অনিচ্ছার মধ্যে তার চলে যাওয়া।

কিন্তু চুম্বনের ঘটনার আস্বাদন তার মধ্যে বহে চলছিল। সে আনন্দের মধ্যে তার থাকা ঘটছিল, যতই সে অচৈতন্যের মধ্যে থাকুক না কেন।

তারপর ঘরের মধ্যে কলরব, ব্যস্ততা। অনেকে যেন তার ঘরে এসেছে। হয়তো ডাক্তার তাকে দেখছেন। জ্ঞান ফেরানোর চেষ্টা করছেন। কিন্তু সে তো এই অজ্ঞান দশায় ভালো আছে, থাকতে ভালোবাসছে।

রমণীর করাঙ্গুলির স্পর্শ এখন আর তার কপালে নেই। কিন্তু রমণীটি কোথাও আছে। তার উপস্থিতি মন থেকে সরিয়ে ফেলতে পারছে না। রমণীর ব্যাপারে তার যে এই আগ্রহ, রমণীটির চুম্বনের কাছে সে যে এত ধরা দিতে চায়, সে ব্যাপারে এক সময়ে ম্যানেজার নিশারের সঙ্গে কথা বলবে সে। নিশারের সঙ্গে খোলাখুলি আলোচনা করা যেতেই পারে। নিশার হল শুধু তার কর্মচারী নয়, বন্ধুও।

কারা যেন তাকে তুলছে বিছানা থেকে। অন্য কোথাও নিয়ে যেতে চায় তাকে। অথচ সে এখান থেকে যেতে চায় না। তাদের কোনো বাধা দিতে পারে না। তাকে এ ঘর থেকে অন্য কোথাও নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। এই রমণীর সঙ্গ থেকে তাকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, এই রমণীর করাঙ্গুলির স্পর্শ থেকে তাকে সরিয়ে নেওয়া হচ্ছে। সে কোথাও একটা চলেছে, কোথাও। সেই রমণী কিন্তু বাধা দিচ্ছে না, যে তার ঠোঁটে তিনটি চুম্বন দিয়েছে। হয়তো তার কোনো ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া আছে, যা সে এই মুহূর্তে জানতে পারছে না। কে সে এই রমণী? কেন তাকে এই মুহূর্তে তার থেকে বিচ্ছিন্ন করা হচ্ছে? সে তো সেই রমণীর করাঙ্গুলির স্পর্শ কপালে পাচ্ছিল, আর ভালো থাকছিল। যারা তাকে বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে চলেছে, তারা কি তার শত্রুপক্ষ? কিছুই জানে না, কিছুই জানে না সে। সেই রমণীকেও জানে না।

৩. তিনটি চুম্বন যে রমণী দিয়েছিল।

সে তখন সাজছিল। তার নাম রিজি। অনেক রাতে সবাই যখন ঘুমিয়ে পড়ে, আর রাত তখন গভীর হয়, রাতের শব্দের ভিতর সে সেজে থাকে প্রায় প্রতিদিন। একটাই ঘর, সে আর তার বৃদ্ধা নানি থাকে এই ঘরে। সে যখন সাজে, তখন হয়তো তার নানি পান সেজে খায়, অথবা পান খেতে খেতে কাঁথা বোনে।

আজ খাওয়াদাওয়ার পর রাত একটু এগিয়ে গিয়েছিল। নানি পান খাচ্ছিল আর তার শৈশবের গল্প বলছিল। উনপঞ্চাশের ঝড়ের কথা খুব মনে পড়ে নানির। বাড়ি ঘরদোর সব ভেঙে যায়। তখন সে ছোটো। সেদিনের কথা শোনাচ্ছিল। আর রিজি ছোট্ট একটা আয়না দেওয়ালের পেরেকে গেঁথে সাজগোজ করছিল। আগে চুল আঁচড়েছে। তারপর মুখে ক্রিম মেখেছে। চোখে কাজল পেনসিল টেনেছে। রাত হলেই সেজেগুজে পরিপাটি সুন্দরী হয়ে ওঠার স্বভাব তার। এমনিতেই সে সুন্দরী। রাস্তার ধারেই এক কুঁড়ে ঘরে থাকে সে। রাস্তায় তাকে প্রায় দিনই বেরোতে হয়, কিন্তু কখনো সাজগোজ করে ভালো শাড়ি পরে নয়। খুবই অবহেলায় উলিঢুলি শাড়ি পরে, দরিদ্র সে, দরিদ্র সেজেই বেরয়। তাতে রূপ খানিকটা তার মলিন হয়। রূপ খানিকটা আড়াল আবডালেও রাখে।

এই ঘরে তার আর নানির বসবাস। আর কেউ নেই। তাদের আর কেউ নেইও। এই ঘরে তারা দুজনে কথাবার্তায় ব্যবহারে কাটায়। এক বিছানায় শোয়ও। রিজির বছর বাইশ বয়স হবে। নানি তাকে রূপসী বলেই চিহ্নিত করে। আর রিজিও জানে সে সুন্দরী, সে জন্য সে প্রায়ই পুরুষদের চোখ থেকে নিজেকে ফাঁকি দেয়। খুব খারাপ ছেঁড়া শাড়ি পরে অবহেলা-যোগ্যা হয়। খুব দরিদ্রদশা নিয়ে চলাফেরা করে যে তাকে তুচ্ছ ভেবে অবহেলা করেই থাকে। সে জন্য তার রূপ পুরুষদের চোখ থেকে আড়াল হয়ে থাকে। আর এইসব আড়াল দিনমানে করার বাধ্যতায় রিজি প্রতিশোধস্পৃহতায় রাতে একা একা ঘরের ভিতর দরজা দিয়ে সাজে, সুন্দরী হয়ে ওঠে। তার এই সাজগোজে সাক্ষী হয় একমাত্র নানি, তারিফও করতে হয় নানিকেই। রিজি প্রতিদিন রাতটা নিশ্চিন্তমনে ঘুমিয়ে পড়তে পারে।

আজ যখন সাজছিল, একটা মোটর সাইকেল তাদের ঘরের সামনে থেমে যায়। তাতে রিজির কাজলের রেখা বেঁকে যেতে পারত। কিন্তু হাত ছিল অভ্যস্ত। দরজায় করাঘাত। কে যেন কিছু বলতে এসেছে। বিপদে পড়েছে কেউ। মোটরসাইকেলে যেতে যেতে ফকিরপাড়ার সাহিলবাবু অসুস্থ হয়ে পড়ে। অত বড় ধনী লোক। মাথার চুল সোজা হয়ে যায় আসুরা নানির। নানিও যায় তাকে ধরে আনতে। এ ঘরের বিছানায় তাকে শুইয়ে দেওয়া হয়। ঘরের ছোট্ট লণ্ঠনটা ছিল জানালার কাছে। সাহিলকে যখন এই ঘরে আনা হল, ঘরের আর এক কোণে ছায়ার ভিতর ঢুকে পড়েছিল রিজি। তার এই সাজগোজ আর রূপ নিয়ে পুরুষদের চোখের সামনে ধরা দেওয়া খুব সুখকর হবে না, চকিতে একথা ভেবে নেওয়ার ভিতর প্রবৃত্তিগত দ্রুততায় আড়াল হয়েছিল।

যখন একজন অচৈতন্য লোক তাদের বিছানায় এসে শুয়েছে, খুবই অসুস্থ, তখন সাজগোজ অবস্থাতে ঘরের ভিতর পদচারণা ও আলোর সামনে দাঁড়ানোতে কোনো ভয় করল না সে। ততক্ষণে লোকটার সঙ্গী পুরুষটি ডাক্তার ডাকতে ফিরে গেছে। মোবাইলের আলো জ্বালিয়ে ফোন করেছে দু-একটা।

আসুরা নানি বলল, 'ও লাতিন, দ্যাখ দ্যাখ বড়লোকটা কেমন মোদের বিছানায় লটকান দিয়ে পড়ে আছে। অমন বড়লোক দশ গাঁয়ে একটা দুটো জোটে। চোখ ভরে দেখে নে।'

রিজি বলল, 'কি বলছ, লোকটা তো অসুস্থ! কোনো জ্ঞান নেই। বেশ দেখতে বটে।'

'তুই একটু ওর কাছে গিয়ে দাঁড়া, প্রাণ ভরে দ্যাখ। ওর কোনো জ্ঞান নেই, তোর কোনো ক্ষতি হবে না।'

'না না ভয় করে আমার!' শিউরে ওঠে রিজি।

'যা না, কাছে যা না। কি সুন্দর একটা মানুষ!'

'ও খুব অসুস্থ নানি, ওর সেবা করা দরকার।'

'একটু কপালে হাত বুলিয়ে দে।'

'বেশ বলেছ, ভালো বলেছ। কিন্তু জেগে ওঠে যদি?'

'না জাগবে না।'

'ঠিক বলছ?'

'আমি এমন অনেক দেখেছি, সহজে জাগবে না।'

বিছানায় লোকটার শিয়রে উঠে বসে রিজি। ধীরে ধীরে কপালে হাত বুলিয়ে দেয়। এমন সাজগোজ করে পুরুষের কাছে থেকে পুরুষের সঙ্গ পাওয়ার সাধ তার ছিল, অথচ সে-পুরুষের কাছ থেকে কোনো ক্ষতি তার হবে না, আজ সে সুযোগ পেয়েছে রিজি। কপালে হাত বুলোয়, যেন আদর করে। নত হয়ে থাকে তার দিকে। কিন্তু পুরুষটি পুরুষ হয়ে উঠতে পারে না। এই অনুভূতি তার খুব ভালো লাগে। কিন্তু ভয় হয়, জেগে না ওঠে। জেগে তো ওঠেই না। এমন পুরুষসঙ্গের অধিকার নিয়ে তার ভালোই কাটছে। সে স্পর্শ করছে কপাল। বাহু দেখছে, বুক দেখছে পুরুষটির।

আসুরা নানি বলল, 'ওকে জাগাতে চাস নাকি?'

'না না। এভাবেই থাকুক।'

'কেমন দেখছিস?'

'ভালোই।'

'বহোত বড়লোক।'

'তুমি চুপ করো, জেগে উঠতে পারে।'

'ওর জন্য তোর দরদ উথলে উঠল যে!'

'তা নয়, আমার রূপ ওকে দেখাব না। আমাকে দেখতে দাও ওকে।'

'প্রাণ ভরে দ্যাখ।'

'আহ্ চুপ করবে!'

আসুরা পান সাজে।

রিজি মাঝে মাঝেই মানুষটার দিকে ঝুঁকে পড়ে। যেন বাসনায়, যেন প্রেমে। অদ্ভুত মাদকতা। খুব ইচ্ছে যায়, অন্তত একটা চুম্বন করার। কিন্তু যদি জেগে ওঠে? বিলম্ব করলে ওরা চলে আসবে। আবার দ্বিধাও আছে, চুম্বন করতে। ইচ্ছা জাগ্রত করে, আবার ইচ্ছাকে মেরে ফেলে। মুখটা নেমে যেতেই চায়, পুরুষটার দিকে নিজেকে শমিত করে, আবার তাড়িত হয়। নিজের সঙ্গে অনেক যুদ্ধ চালায় সে। একটা মাত্র চুম্বন করবে। এক সময় ধীরে ধীরে ঠোঁট নামিয়ে দেয় পুরুষটার ঠোঁটে। চুমু খায়। কিন্তু একটা চুম্বনে সাধ পূর্ণ হয় না, আবার ঠোঁট নামিয়ে দেয় পুরুষটার ঠোঁটে। পুরুষটা তো জানতে পারছে না, এ চুম্বনের কোনো দায় তাকে সামলাতে হবে না। সে এখানে স্বাধীন। অন্তত তিনটে চুম্বন করা ঠিক হবে। কসম যখন লোকে খায়, তিনটে কসম খায়। সত্যি যখন বলে তিনসত্যি বলে। এক্ষেত্রে তিনটি চুম্বনের প্রেরণা

পেল রিজি। আর তৃতীয় চুম্বনটা নামিয়ে দিল। আর দেখলে পুরুষটিকে চোখ মেলে তাকাতে। চোখ মেলে তাকানোর ভিতরই তিন নম্বর চুম্বনটা দিয়েছে রিজি। পুরুষটি তারপর চোখ বুঁজিয়ে ফেলেছে। সে নিশঙ্ক এই ভেবে যে, পুরুষটির বোধে এই তিন চুম্বনের কোনো স্মৃতি থাকবে না।

তারপর তো ওরা এল, আর নিয়ে চলে গেল পুরুষটাকে। ওরা আসতে, তার রূপ নিয়ে, সাজগোজ নিয়ে ঘরের কোণে ছায়ায় আশ্রয় নিয়েছিল রিজি। ওরা চলে যাওয়ার পর নানি তাকে সাবাশি দিয়েছিল। নানি দেখেছিল, তিনটি চুম্বন খেতে।

৪. সব পুরুষের মধ্যেই বহুগামিতার ইতিহাস আছে।

কাল সারারাত অচৈতন্য অবস্থায় কেটেছে সাহিলের। এখন ফকিরপাড়ায় তার দোতলা বাড়ির বিছানায় শুয়ে আছে চোখ মেলে। যেন সে এক অচৈতন্য সুদীর্ঘ ঘুম ঘুমিয়েছে। তাকে সুস্থ হয়ে উঠতে দেখে সকলে খুশি। কোনো শারীরিক অসুবিধে নেই। ডাক্তার হাজরা সকালে আর একবার দেখে গেছেন। বউ ফাহমিদা মুসুম্বির রস খাইয়ে গেল, মাথাটা কোলে করে বসার ভঙ্গিতে। ডাক্তার বলছেন, কিছু হয়নি। তবুও কিছু রক্ত পরীক্ষা করতে দিয়েছেন। লিপিড প্রোফাইল, ই সি ডি সি, ই এস আর, ব্লাড সুগার এই সব। সাবধানের মার নেই।

সাহিল রাতে নিশারের মোটরসাইকেলের পেছনে বসেছিল। তারপর কী হয়েছিল, কিছু আর মনে নেই। কোনো কথাই সে মনে করতে পারছে না। এখন এত সুস্থ যে বাগনানে তার অফিসে যেতে চাইল। কিন্তু কালকের ঘটনার পর বউ, শালি, ছেলেমেয়েরা কেউই তাকে যেতে দিতে চাইছে না।

কিন্তু একটা স্মৃতি তার মনে আছে, অপরূপ সুন্দরী এক নারী তাকে চুমু খেয়েছিল। এবং তার সঙ্গে সে অনেকটা সময় কাটিয়েছে।

কে, কোথায়, তাকে চুম্বন করেছিল কিছুই জানে না সে। অথচ এই অনুভব পাচ্ছে সে। যেন কোনো অলৌকিক মায়ালোকে চলে গিয়েছিল সে; সেখানে এক রমণীর দেখা হয়েছিল, পরস্পর তারা কাছাকাছি হয়েছিল। সবাই তো বলছে গতকাল সারারাত তো সে অচৈতন্য অসুস্থ অবস্থায় ছিল, সেখানে এই নারী কীভাবে আসে ভাবতে পারে না সাহিল। তবে কি সব ঘোর, স্বপ্ন? এমন স্বপ্ন মানুষ দেখতেই পছন্দ করে। সেই স্মৃতি ও স্বপ্নের ঘোর তাকে ঘোরতর একাকি নিশ্চুপ করে রেখেছে, অথচ সে নিজে বুঝতে পারে, খুবই সুস্থ। তার এই চুপ করে থাকা দেখে বাড়ির সবাই ভাবে অসুস্থ। তাই তাতে তার ভালো হয়, কারো সঙ্গে কথায় যেতে হয় না। কেউ তাকে এসে বিরক্ত করে না। আর সে সেই স্মৃতি আর স্বপ্নের অনুভব চারণার মধ্যে থাকে, থাকতে ভালোবাসে। তার স্মৃতি একেবারে তার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারে না, তেমন কিছু একটা ঘটেছিল। কোনো নারী ছিল তার সেই আচ্ছন্নতার ভিতর। আর নিশ্চিত সে দেখেছিল, সেই নারী তার ঠোঁটে

চুমু খেয়েছিল। কে সেই নারী? কোথায় তার সঙ্গে দেখা হয়েছিল? এই বাড়ির বিছানায় কী? স্মৃতি কিন্তু তা বলছে না. বলছে অন্য কোনো ঘরে, অন্য কোনো বিছানায়। ঘর আর নারী তার কাছে ছিল অচেনা। কিন্তু খুবই ঘনিষ্ঠ ভঙ্গিতে ছিল সে, যেন ভালোবাসছিল, প্রেম ছিল সেই ঘনিষ্ঠ উপস্থিতির ভঙ্গিতে। সেও ভালোবেসে ফেলেছিল সেই নারীকে।

সে রাতে কোনো একটা ঘরে আশ্রয় পেয়েছিল, যা বাড়ির লোক তাকে বলছে না। আর সেও জানার ব্যাপারে প্রশ্ন করছে না। নিশারকে প্রশ্ন করলে পাওয়া যাবে, সত্য ঘটনার কথা। নিশার এখন নেই। ফোন করে ঘণ্টায় ঘণ্টায় কথা বলছে। ফাহমিদা তার সুস্থ থাকার কথা জানাচ্ছে।

ছেলেমেয়ে দুজনেই স্কুল যাওয়ার জন্য তৈরি হচ্ছে। মেয়ে নাইনে পড়ে, ছেলে এইটে। ওরা পিঠোপিঠি ভাই বোন। দুজনেই বাগনানে পড়ে। মেয়ে আনিসা তার খুবই প্রিয়, তাদের মধ্যে খুব সখ্য আছে। ছেলে ফরিদ একটু সাধাসিধে, আনিসার মতো বুদ্ধিমত্তা তার নেই। ওদের স্কুলে যাওয়ার প্রস্তুতিতে সাহায্য করছে শালি জাসমিন। দিন ছয়েক হল এসেছে। আরও কিছুদিন থাকবে। জাসমিন এ বাড়িতে থাকলে ভালোই লাগে সাহিলের। তার বিয়ের সময় এই ছোটো শালি জাসমিন কত ছোটো ছিল, ক্লাস থ্রিতে পড়ত। এই বছরই ইসলামিক হিস্ট্রিতে এম. এ. করেছে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। শ্বশুরবাড়িটা তার হাওড়া শিবপুরের কাজিপাড়ায়।

সে যখন নিশারের মোটরসাইকেলে চড়েছিল, তারপরেই সে এক মায়ালোকে চলে গিয়েছিল। কোনো অসুস্থতা ছিল না তার। নিজে কেন যে খোয়া গিয়েছিল, কেন সে সারারাত অচৈতন্য অবস্থায় ছিল, তার কারণ খুঁজতে সেদিনের কথা ভেবেছিল। সেদিন দুপুরে শালি জাসমিনকে ঘুমন্ত অবস্থায় চুমু খেয়েছিল। অথচ জাসমিন জানতে পারেনি, নিজের খুব অপরাধবোধ হয়েছিল। তার মতো এমন একজন সৎ মানুষ সে কিনা শালি জাসমিনকে চুমু খেয়েছে—হোক না ঘুমিয়ে ছিল, সে তো অপরাধই। আর বোধ হয় এই অপরাধের গ্লানি সেদিন তাকে আচ্ছন্ন চৈতন্যরহিত করেছিল। অপরাধে মানুষ এভাবেই হয়তো নিজের শাস্তি নিজে নেয়। তাতে মনে শান্তি আসে। না হলে অপরাধের কাঁটা বিঁধতে থাকবে। তেমনই একজন ভালো মানুষ সাহিল। শালিকে চুমু খাওয়া তার অপরাধ হয়েছে। যদিও জাসমিন ঘুমিয়েছিল, জানতে পারেনি, জাসমিনের চোখ তাকে অপরাধী হিসেবে দেখেছে, সেটা ছিল তার পক্ষে খুবই অহিত কিছু, জীবনযাপনের সংকটে তার থাকা হত। হয়তো বউ ফাহমিদাকে জাসমিন বলে দিতেও পারত। যাক, জাসমিন ঘুমিয়েছিল। এই অপরাধ আর জীবনে কোনোদিন করবে না।

কিন্তু সেই অপরূপ সুন্দরী রমণী গত রাতে তাকে চুমু খেয়েছে, সেই স্মৃতি তাকে এক ভালোলাগার আস্বাদে নিয়ে যায়। সে জানে নিজে চুমু খায়নি সে রমণীকে, রমণী আত্মউদ্যোগী হয়ে চুমু খেয়েছে। তার অপরাধ কিছু ছিল না। সে যে সেই

চুম্বনের স্বাদ ভালোবাসছে, আর সেই নারীর প্রতি প্রেমবোধ করছে, তাতে নগণ্য কিছু অপরাধ হয় বইকি, কিন্তু এটা সে রোধ করতে পারে না, প্রহরার জোরও নিজের মন থেকে পায় না। যেন সে কলঙ্কিত হতে চায়, যেন সে সর্বনাশে ডুবে যেতে চায়।

গতরাতের ঘটনা তাকে এমনই এক রূপান্তরে নিয়ে গেছে। বউ শালিদের সেবা নেয়, কিন্তু মন পড়ে থাকে সেই নারীর দিকে। আর তা করতে পারার একাগ্রতার জন্য নীরবতা পছন্দ করছে, আত্ম-পরিবারের কাছে অসুস্থ থেকে যাচ্ছে। সে অসুস্থ, সত্যিই কি অসুস্থ?

জাসমিন কাছে এসে দাঁড়াল সাহিলের। 'কেমন আছেন?'

অনুচ্চকণ্ঠে সাহিল জানাল, 'ভালো।'

'কেন এমন হল আপনার?' জাসমিন শরীরে লাস্য তুলে এনে দেখায়। যেন জাসমিনের সেই ভঙ্গির ভিতর কোনো ইঙ্গিত আছে, কোনো আমন্ত্রণও আছে। 'আপনার কোনো জ্ঞান ছিল না।'

'সে কথা আমি জানি।'

'কী হয়েছিল সেদিন যে অমন হয়ে গিয়েছিলেন?'

চমকায় সাহিল। কী ইঙ্গিত করে জাসমিন? কী ঘটনা ঘটার ইঙ্গিত করছে সে, সেকি জাসমিনকে সজ্ঞানতার ভিতর চুমু খেয়েছিল? যতদূর জানে, জাসমিন ঘুমিয়েছিল, আর সে এক চকিত অপরাধ করে ফেলেছিল, চুমু খেয়ে। তার জন্য নিজের মনে পীড়িত হয়েছে, অপরাধের শাস্তিও নিজে থেকে নিজেকে দিয়েছে।

জাসমিন তেমনই রহস্যময় হাসতে হাসতে বলল, 'গতকাল দুপুরে আপনি বাগনান থেকে ফিরেছিলেন দুপুরে ভাত খেতে আসার জন্য। আপনি দুপুরে ঘুমোননি, বেশ খানিকটা পরে আপনি আবার বাগনান ফিরে গিয়েছিলেন।'

'হ্যাঁ।' জাসমিন এসব কথা যে বলছে, তার অর্থ কী? জাসমিনের সজ্ঞানতার ভিতর কি চুমুটা খেয়েছিল সাহিল?

জাসমিন বলে, 'আমি ঘুমিয়ে গিয়েছিলাম।'

ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ে সাহিলের। জাসমিনকে দেখে বেশ প্রেমার্তি পায়ও। সব পুরুষের মধ্যেই বহুগামিতার ইতিহাস আছে। সে এখনও তাই আসক্ত হয়। কিন্তু শালিকে এই দেখার প্রেম পর্যন্ত নিজেকে রাখতে পারে সাহিল, তার বেশি কিছু লঙ্ঘন করতে চায় না, যা সে গতকাল দুপুরে সহসা ঘটিয়ে ফেলেছিল, আসলে সেটা ছিল গুরুতর অপরাধ।

শুধু সেই নারীটির কথা ভেবে সব গোলমাল হয়ে যাচ্ছে। সব যুক্তি গুলিয়ে যাচ্ছে। সৎ-অসতের ভেদরেখা হারিয়ে যাচ্ছে।

জাসমিন বলল, 'অনেক ঘুমিয়েছেন, সারারাত, আজ দুপুরে আর ঘুমোতে পারবেন না। আমি কিন্তু আমার বিছানায় ঘুমব।'

'বেশ।'

'কিন্তু বাড়িতে শুয়ে বসে আপনি করবেন কী? আপনি তো সুস্থ।'

'এই পায়চারি করব।'

'আর কী করবেন?'

'তোমাকে দেখব।' সাহসের সঙ্গে এই রসিকতা করে সাহিল।

জাসমিন হেসে ফেলে জোরে, 'শুধু দেখবেন?' জাসমিনের ঠোঁটে হাসির চটুলতা। আবার একই কথা উচ্চারণ করে, 'শুধু দেখবেন?'

কী ইঙ্গিত করে জাসমিন? ধরতে পারে না সাহিল।

অট্টহাস্য করতে করতে ঘর থেকে বেরিয়ে যায় জাসমিন।

৫. এক বুড়িকেই কি অপরূপ সুন্দরী ঠাওরেছিল?

দুপুরে সত্যিই ঘুম এল না সাহিলের। আর নিজেদের বিছানায় বউ ফাহমিদা এসে শুতেই ঘুমিয়ে পড়ল। ফাহমিদার ঘুম তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে থাকল সাহিল। অন্য ঘরে ঘুমচ্ছে জাসমিন। সে শুধু জেগে। সুস্থই আছে। কোনো ঝামেলা নেই শরীরে। বারান্দায় এসে চেয়ারে বসে। এঘর ওঘর ঘুরে বেড়ায়। গতকালের মতো একই ভঙ্গিতে জাসমিন ঘুমোয়। ফাহমিদা কেমন বেঢপ মোটা হয়ে গেছে। বয়সের *সঙ্গে মুখের লাবণ্যও ঝরে পড়েছে। একেবারে সাধারণ, অতি সাধারণ এক* মেয়েমানুষ। ফাহমিদার প্রতি আগ্রহ ও আকর্ষণ কমে গেছে সাহিলের। কেন এমন হয়? জানে না সে।

শুধু মনে পড়ে যাচ্ছে সেই রমণীর কথা। যে-রমণীর ঘরে সে ছিল, তার বিছানায় ছিল, আর সে ছিল শিয়রে, যে কিনা তার কপালে করাঙ্গুলির স্পর্শ দিয়ে গেছে, আর চুম্বন করেছে ঠোঁটে। নিজের মোবাইল থেকে নিশারকে ফোন করেছিল, জরুরি এক আলোচনা আছে, জানিয়ে আসতে বলে। এই দুপুরে আসবে নিশার। তার কাছ থেকেই জানবে গত রাতে সে কোথায় ছিল, কোন্ বিছানায় ছিল, সে নারীরই বা কে? খুব চুপি চুপি এসব জানতে হবে নিশারের কাছ থেকে। বউ-শালি না জানতে পারে। তার এই জানাটা আসলে গোপন অভিসার। নিশারের কাছে তার গোপনতার কিছু নেই, সব কথাই বলে, বলতে পারে। শুধু গতকাল যে ঘুমন্ত অবস্থায় শালিকে চুমু খেয়েছে, একথা জানায়নি। আসলে জানানোর মতো ফুরসত পায়নি। যেহেতু শালি জানতে পারেনি, এই চুম্বনের কোনো বাস্তবতা নেই, সেহেতু নিশারকে বলার কিছুও নেই। না বললেও চলে।

মোবালই থেকে আবার নিশারকে ধরে সাহিল। 'বেরিয়েছ?'

'বেরলেই তো যেতে দশ বারো মিনিট মাত্র লাগবে মোটর সাইকেলে।'

'বেশ, বেরোতে আর দেরি কোরো না।'

'না না বেরোলাম বলে। কিন্তু আপনি এত উতলা কেন?'

'তুমি এসো, বলব।'

'কোনো গোলমাল? শালি তো আছে।'

'ওসব কিছু নয়। গোপনে বলব।'

'আমি যাচ্ছি।'

'দেরি কোরো না।'

'এই গেলাম বলে।'

'এসো।' ফোন কেটে দেয় সাহিল। ঘরে ফিরে এসে দেখে বউকে। অকাতরে ঘুমচ্ছে। পাশে শুতে ইচ্ছে করছে না, পাশে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়তে ইচ্ছে করছে না। পাশের ঘরে জাসমিন ঘুমচ্ছে। পাশের ঘরে গিয়ে দেখে আসা যায় ঘুমন্ত জাসমিনকে। দেখার মধ্যে কোনো অপরাধ থাকবে না। পায়ে পায়ে পাশের ঘরে গেল সাহিল। কালকের মতোই ঘুমচ্ছে। তার কি সত্যিই অন্য নারীর প্রতি আসক্তি জন্মাচ্ছে? ছি ছি কী বাজে তার মনোভঙ্গি। নিজেকে শাসন করে বারান্দায় ফিরে আসে। শালি তো জানতে পারল না, তাকে চুরি করে দেখে এসেছে! তাতে বোধ হয় কোনো অপরাধ প্রমাণ হল না অন্তত শালির চোখে। কালকে চুমু পর্যন্ত খেয়েছে, শালি জানতে পারেনি। নিজের কাছে নিজে খুবই অপরাধ করেছে। সে এত ছোটো, এত নীচ? হাঁটাচলা করে বারান্দায়। আর একটি বারের জন্যও শালির ঘরে উঁকি দেবে না, নিজেকে সৎ আর নিরপরাধ রাখার সংকল্প করে। অপেক্ষা করছে, নিশারের জন্য। সে সুস্থ যখন নিশারের সঙ্গে ব্যাবসাক্ষেত্রে ফিরে যাবে। তার ব্যাবসার কর্মকাণ্ড কমকিছু নয়। এলাহি ব্যাপার। পাঁচটা লরি খাটে। চারটে মারুতি আর একটা টাটা সুমো খাটে। এন-ডি ব্লকে ফ্ল্যাট তুলছে, সেখানে ব্যস্ততা। নিশারের সবখানেই ব্যস্ততা। অন্য এক কর্মচারী মোটর সাইকেলে বসিয়ে দুপুরের খাবার খেতে নিয়ে আসে প্রতিদিনই। রাতে ফিরিয়ে দিয়ে যায় নিশার। আজ দুপুরে নিশার আসবে। এমনিতেই আসত, তার অসুস্থতার জন্য। গত রাতে ডাক্তার হাজরাকে নিয়ে এসেছিল, তারপর একবার সকালে নিয়ে এসেছিল। খুব ধকল গেছে নিশারের।

ম্যানেজার নিশার এসেছে। প্রতীক্ষার অবসান হল সাহিলের। অন্য একটা ঘরে প্রায় দরজা বন্ধ করে মুখোমুখি নিশারের সঙ্গে চেয়ারে বসে সাহিল।

নিশার একবার সাহিলের মুখে দৃষ্টি বুলিয়ে নিল। খুব বুদ্ধিমান সে। 'কী হয়েছে আপনার?'

'কিছু একটা হয়েছে। কিন্তু জানি না।'

'বলুন কী হয়েছে?'

'আমাকে কাল রাতে কোথায় নিয়ে গিয়েছিলে?'

'কোথাও নিয়ে যাইনি তো আপনি বাড়ি ফিরছিলেন, তারপর অসুস্থ হয়ে পড়লেন। অজ্ঞান হয়েছিলেন সারারাত।'

'হ্যাঁ, আমি যখন অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলাম, তখন আমাকে কোথাও নিয়ে

গিয়েছিলে কি?'

'আপনার কিছু মনে নেই?'

'কিছু একটা মনে করতে পারছি, কিন্তু ধরতে পারছি না।'

'কী মনে করতে পারছেন?'

'আমার মাথার কাছে কোনো এক মেয়েলোক বসে আমার কপালে হাত বুলিয়ে দিয়েছিল। আর'—

'আর কী?'

'সে নারী আমাকে চুমু খেয়েছিল আমাকে জানতে না দিয়ে। আমার একবার চোখ খুলে গিয়েছিল, মুহূর্তের জন্য জ্ঞান ফিরে এসেছিল, আমি দেখেছিলাম আমার ঠোঁটে ঠোঁট দিয়ে সে নারী চুমু খেয়েছে। আর দেখেছি, সে নারী অপরূপ সুন্দরী। আমার সে দেখা ভুল হতে পারে না, তুমি এবার বল, যা তুমি জান?'

'আমি যতদূর জানি আপনি হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়লে হতদরিদ্র বাড়িতে আপনাকে তুলতে বাধ্য হয়েছিলাম। সেটা ছিল এক বুড়ির। সেখানে কোনো ছুঁড়ির দেখা পাইনি। আপনি সেই বুড়িটাকে অপরূপ সুন্দরী ঠাওরেছেন নিশ্চয়। আর সেই বুড়ি হয়তো চুমু খেয়েছে।' হো হো করে হেসে ওঠে নিশার।

'আমার এতটা বিভ্রম হতে পারে? আমাকে কোনো এক বুড়ি চুমু খেয়েছিল, অথচ তাকে অপরূপ সুন্দরী মনে হয়ে থাকবে। তুমি বলো, তুমি কোন্ বাড়িতে তুলেছিলে?'

'ওই যে বড় রাস্তা থেকে নেমে, কিছুটা এগিয়ে আসার পর যে কালভার্টটা পড়বে, কালভার্টটা পেরিয়ে আসার ঠিক পরেই যে বাঁকটা পড়ছে, সেখানেই যে মাটির বাড়িটা। রাস্তার উলটো দিক দিয়ে বাড়িতে ঢুকতে হয়। সামনে একটু উঠোন আছে। টালির ছাওয়া মাটির বাড়ি। আমি সে ঘরের দরজায় আঘাত করেছিলাম। এক বৃদ্ধা বেরিয়ে এসেছিল।'

'মনে করে দেখো, কোনো তরুণীকে দেখেও তুমি ভুলে গেছ!'

'আমি ওসব খেয়াল করিনি। আমি তখন ছিলাম আপনাকে নিয়ে ব্যস্ত। আর আপনাকে রেখেই ডাক্তার আনতে চলে আসি।'

'আবছায়ায় আড়ালে কোনো তরুণী আছে, এমন ইঙ্গিত তুমি বুঝে নিতে পারছিলে কী?'

'না, ওসব কিছু মনে হয়নি।'

'অথচ আমার অতটা ভুল হওয়ার কথা নয়।'

'আপনাকে সত্যি কোনো নারী চুমু খেয়েছিল?'

'তার স্মৃতি আমি ভুলতে পারছি না।'

'আমার অবর্তমানে তাহলে ঘটেছে।'

'হ্যাঁ তোমার অবর্তমানেই তো।'

'কোনো যুবতীর প্রতি আসক্তি জন্মেছে? কোনো যুবতীকে আপনি জীবনে পেতে চান? সে তো আপনি সম্মতি প্রকাশ করলেই হয়। আপনি আর একটা বিয়ে করতেই পারেন।'

'তওবা, তওবা।' জিভ কাটে সাহিল। 'না, না আমি সেই রমণীর হদিস পেতে চাইছিলাম, যে কি না'—

'সে রমণী যদি সত্য হয়, তাহলে তাকে হতদরিদ্রই জানবেন।'

'আমি সত্য জানতে চাই, যে কিনা আমার কপালে'—

'ঠিক আছে খোঁজখবর নেওয়া যেতে পারে। কিন্তু অমন গরিব নিচু ঘরে নিজেকে নামাবেন না আর। অসুস্থ হয়েছিলেন, তুলতে বাধ্য হয়েছিলাম ঠিক আছে। সত্যি সত্যি কোনো সুন্দরী থাকলেও আপনার নির্বাচন সেখানে নিজেকে খাটো করবে। আপনি চাইলে কমবয়সী ও সম্ভ্রান্ত এবং শিক্ষিত রমণী পাবেন।'

'আহ্, ভুল করছ, আমি রমণী-সম্ভোগী হয়ে উঠিনি, লোভী কার্মাতও হয়ে উঠিনি। আমি একটা প্রেমের কিস্‌সার খোঁজ পেয়েছিলাম। যে কিনা আমাকে ভালোবাসছিল, যে কিনা ভালোবেসে আমার ঠোঁটে ঠোঁট ডুবিয়ে দিচ্ছিল। তোমাকে দালালি করতে বলছি না। তোমার কাছ থেকে সত্য তথ্যটুকু জানতে চেয়েছিলাম। এই প্রেমের ক্ষেত্রে তুমি কোনো সুরাহা করতে পারবে না। যাও, তুমি কাজে যাও।'

থমকে যায় নিশার। 'রাগ করলেন মালিক। আমি ভুল করে এক্ষেত্রে প্রেম বিষয়টা সরিয়ে রেখেছিলাম।'

'যাও, তুমি যাও। আমাকে একা থাকতে দাও।'

'কোনো আদেশ উপদেশ সাহেব?'

'নেই।'

৬. আহত সিংহীর মতো গরজে ওঠে, 'ভীরু, কাপুরুষ!'

সন্ধ্যায় রক্তের সব রিপোর্ট পাঠিয়ে দিয়েছে নিশার। ডাক্তার হাজরাকে রিপোর্টগুলো দেখিয়ে তবে পাঠিয়েছে। রিপোর্টগুলো তার কাছে পাঠানোর অর্থও নেই। সে যে মৃত্যু-পরোয়ানার বাইরে, এমনটা এই নথিগুলো তেমন রকম প্রমাণ দিতে তার কাছে নিশার পাঠিয়েছে। সন্ধ্যায় একপ্রস্ত ডাক্তার হাজরার সঙ্গে ফোনে কথা বলে সে। তার কিছু হয়নি। সবরকম খাবার খেতে পারবে। শরীর একেবারে ফিট আছে। একপ্রস্থ বউ কথা বলল। তার পক্ষে জেনে নেওয়া খুব জরুরি, তার স্বামী ঠিকঠাক আছে কিনা, অনিয়ম করতে পারবে কিনা। আর-এক প্রস্থ জানল শালি জাসমিন। জাসমিনের জানতে চাওয়ার মধ্যে কেতা আছে প্রচুর। সে যে আধুনিকা, অল্পবয়সী, তাতে প্রমাণ করল।

জ্যোৎস্নায় ভরা ছাদে আকাশের তলায় মোবাইল থেকে তারা কথা বলছিল। বউ শ্বশুরবাড়িতে খবরটা পৌঁছে দিল। ও বাড়ির সঙ্গে ফাহমিদার কথা আর ফুরোয়

না।

বিকেলে নিশারের সঙ্গে বাগনানে চলে যেতে চেয়েছিল সাহিল। বউ বারণ করে। শালি বেশি বাধা দেয়। কেন এতটা জোর ফলায় শালি?

সাহিল যেতেই চেয়েছিল। বেরিয়ে পড়তে পারলে সেই ঘরে কোনো যুবতী রমণীর সন্ধানে যেতে পারত। সেটা একটা প্রেমের অভিসার হত। প্রেমের ব্যাপারেই যত বাধা হয়ে থাকে। মনে হয় যেন এই সন্ধ্যায় বেরিয়ে যায়। সেই রমণীর সন্ধান করে। সেই রমণীর সঙ্গে তার সাক্ষাৎ ঘটুক। প্রেম-সম্ভাষণে থাক তারা! কিন্তু বউ শালি তাকে আগলে রেখেছে। যেহেতু গতকাল সারারাত অচৈতন্য ছিল।

ছাদে ফোনাফুনি খানিকক্ষণ চলল। সাহিলের এসব ভালো লাগে না। ছেলেমেয়েরাও একটু আগে পর্যন্ত ছিল। তাদের মাস্টার আসার জন্য তারা নীচে নেমে গেছে। বউ ও শালি নিজেরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কথা বলছিল, দুই বোনে অন্তরঙ্গ কিছু কথা। সাহিল একা হয়ে পড়ছিল, একা হয়ে পড়ছিল ক্রমশ। একা থাকতে পছন্দও করছিল। আকাশ ভরা জ্যোৎস্না। চারপাশ ভেসে আছে জ্যোৎস্নায়। গাছের গায়ে পাতায় পাতায় পিছলে পড়ছে জ্যোৎস্না। আকাশের অনন্তে তাকিয়ে থাকতে তার ভালো লাগে।

ছাদে একটা মাদুর বেছানো হয়েছে। তাতে বসে থাকে সাহিল। কিছু একটা ভাবে, কিছু একটা ভাবনায় থাকে। গতকাল দুপুরে ঘুমন্ত জাসমিনের ঠোঁটে চুমু খেয়েছিল। এটা তার অপরাধ হয়েছিল। জাসমিনকে নিয়ে তার বাসনা ছিল বোধহয়। জাসমিন সেই চুম্বন বুঝতে পারেনি বলে একভাবে বেঁচে গেছে সাহিল, অপরাধ গোপন করা গেছে। জাসমিনের সঙ্গে চোখে চোখ রেখে কথা বলতে পারবে।

জাসমিনে সে যে লোভার্ত হয়নি তা নয়। একটা চুমুতেই সীমায়িত রেখেছিল তার লোভ। বেশ ঝকঝকে মেয়ে। চমৎকার কামনা জাগায়। কিন্তু লোভ দেখানো অন্যায় হয় তার পক্ষে। এই জাসমিনকে দেখে মনেই হবে না তার বিয়ের সময় জাসমিনের বয়স মাত্র আট বছর ছিল। বছর সতেরো বিয়ে করেছে এক আধা মধ্যবিত্ত পরিবারে। তখন এত টাকা পয়সায় ফুলে ফেঁপে ওঠেনি। বাবার দশকর্মা ভাণ্ডারে থাকত। বাবার অকাল মৃত্যুর পরই ব্যাবসার হাল নিজের হাতে আসে। সে তো দশ বছর আগে। তারপর এত ব্যাবসাপাতি, এত টাকাকড়ি; এত কিছু।

জাসমিনের বয়স কম হলেও জাসমিনকে দুর্বল করার পক্ষে তার বড়লোক হওয়া যথেষ্ট, সে-সব সুযোগ থাকলেও, সে-সব ব্যাপারে যেতে চায় না সাহিল। সেখানে কোনো প্রেম নেই। একটা প্রেম চাইছে সাহিল, প্রেম, শুধু প্রেম, তাতে মেতে থাকা যায়, বুকের মধ্যে তোলপাড় হবে, বুক শিরশির করবে। জাসমিনে শুধু মুহূর্তের লোভ ছিল, প্রেম নেই।

এত টাকাকড়ি, এত ব্যাবসাপাতির রমরমাতে বড় ক্লান্ত হয়ে পড়েছে সাহিল। একটু শান্তি, সুখানুভূতির প্রয়োজন হয়েছে তার।

বাবার মৃত্যুর পর বাগনানে দশকর্মা ভাণ্ডার উদ্যোগ নিয়ে বড় করল, আয় বাড়াল

চতুর্গুণ। তখন বাগনানের এন-ডি ব্লকের জমি জলের দরে বিকোচ্ছিল। কিনে ফেলল বিঘে দশেক জমি। তার পাঁচ বছর পরই বাগনানের এন-ডি ব্লকে মধ্যবিত্ত শ্রেণির বাড়ি করবার ধুম দেখা দিল। জায়গার দাম হু হু করে বেড়ে গেল। মধ্যবিত্ত চাকুরিজীবীরা কাছেই রেলস্টেশন পায়। কলকাতা থেকে দূরত্ব কমে। আর এখানেই স্কুল, কলেজ, হাসপাতাল, ডাক্তারপাতি, ইলেকট্রিকের যোগানও ভালো। রাস্তাঘাট ভালো। বিশুদ্ধ জলের যোগান আছে। বাজার ও টেলিফোনের সংযোগও সহজ। একশ্রেণির মানুষ এখানে বাড়ি করার ব্যাপারে এগিয়ে এল। আর জলের দরে কেনা জমি সাহিল প্লট করে করে চড়া দামে বিক্রি করতে লাগল। লরি মারুতি টাটা সুমো কিনল, নতুন ব্যবসায় নেমে গেল। এখন একটা ফ্ল্যাটও বানাচ্ছে। আল্লা তাকে ছপ্পর ফুঁড়কে দিয়েছে। এখনও বিঘে দেড়েক জমি হাতে আছে সেগুলো সুযোগমতো চড়া দামে বিক্রি করবে।

আত্মপরিবার নিয়ে বাগনানে চলে যেতেই পারত সে, এত সব সুবিধে ভোগ করতে। ন-কিলোমিটারের দূরত্বও কমত। কিন্তু ফকিরপাড়া না ছাড়ার কারণ, এই পাড়ার সঙ্গে তার ইতিহাসের সংযোগ আছে, সেই ইতিহাসের ঐতিহ্যকে মান্যতা দেয় সে। প্রায় দুশো আড়াইশো বছর আগে ফকির বিদ্রোহ যখন বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে, একজন ফকির-সৈনিক এখানে এসে আত্মগোপন করে। আর তারই নামে এই পাড়া ফকিরপাড়া। সাহিল বিশ্বাস করে সেই ফকিরের দোওয়াতেই তার এই এত টাকাকড়ি, সেজন্য ফকিরপাড়া ছেড়ে যাওয়ার কথা ভাবতেই পারেনি।

এ পাড়া ছেড়ে যাওয়া যেমন অন্যায় হয়, তেমনই এ পাড়াতে আদি বংশধর ছাড়া অন্য কারো প্রবেশের অধিকার নেই। জামাইরা এসে বসত করতে পারে। কিন্তু অন্য কেউ নয়, যাদের সঙ্গে এ পাড়ার রক্তের সম্পর্ক নেই। পাড়ার অন্য অনেকে নানা স্থানে গেছে। কিন্তু সাহিল যেতে পারবে না। বংশ পরম্পরায় পাড়ার মাহাত্ম্যে ফকিরের বর আছে, সেই সুবিধে ভোগ করে আসছে পাড়ার মানুষজন বংশ পরম্পরায়। কেউ আগুনে পুড়ে মরে না, কেউ জলে ডুবে মরে না, কেউ সন্তান প্রসব করতে গিয়ে মরে না। এই আশীর্বাদের সুফল ভোগ করে আসছে, পাড়ার মানুষজন বংশপরম্পরায়। আর পাড়ার মানুষজনদের কাছেও ফকিরের তিনটি নিষেধ আছে। এক, পাড়ার কেউ অবৈধ যৌনাচার করবে না। দুই, সুদ খাবে না। তিন, একাধিক বিয়ে করবে না। এক স্ত্রীত্বে সন্তুষ্ট থাকতে হবে।

এই শর্তের কিছু কিছু ব্যতিক্রম ঘটেছে। কেউ একটার বেশি বিয়ে করে ফেলেছে, কেউ অবৈধ যৌনাচার করেছে গোপনে। কিংবা সুদও খেয়েছে। সেজন্য ফকিরের দোওয়ার ব্যত্যয়ও ঘটেছে। কেউ জলে ডুবে মরেছে, কেউ আগুনে পুড়ে মরেছে, কেউ সন্তান প্রসব করতে গিয়ে মরেছে। অনাচার হয়েছিল বলেই ফকিরের বর কমে গেছে। সে-সব ব্যতিক্রমী ঘটনা। এখনও সেই আশীর্বাদ আছে, ফকিরপাড়ার মানুষরা মনে করে। আর সাহিল সেজন্যই এত সুখের হাতছানি সত্ত্বেও বাগনানে

বসবাস তুলে নিয়ে যেতে পারে না। প্রতিদিন যাতায়াতের ক্লেশ সঁয়।

ছাদে জ্যোৎস্না আর জ্যোৎস্না। সাহিলের একা থাকতে ভালো লাগছিল। দুই বোন তফাতে দাঁড়িয়ে এতক্ষণ নিজেরা কথা বলছিল। একটু আগে ফাহমিদা নীচে নেমে গেছে। প্রাইভেট টিউটরকে চা দিতে হবে তাকে।

তফাতে একা একা জাসমিন দাঁড়িয়ে থাকে জ্যোৎস্নায়।

সাহিল হঠাৎ ভাবল, এই জ্যোৎস্নায় বাইরে বেরিয়ে যাবে কিনা। যেমনই ভাবনা, তেমনই তৎপর হল। এগিয়ে গেল ছাদের দরজার দিকে।

আর দেখল জাসমিনকে ছাদের দরজার সামনে আগলে দাঁড়াতে।

সাহিল বলল, 'কি হল, আগলে দাঁড়িয়ে আছ কেন?'

জাসমিন হাসল। জাসমিনের হাসিটা অদ্ভুত, রহস্যময়। 'আপনাকে আরও কিছুক্ষণ এখানে থাকতে অনুরোধ করছি।'

'কেন?'

'এমনি। আপনার সঙ্গে থাকব।'

'এমনি?'

'আপনার ইচ্ছে করছে না?'

'না।'

'আপনি কাল দুপুরে আমি যখন ঘুমিয়েছিলাম, আমার ঘরে গিয়েছিলেন। আর'—

'আর কী? তুমি জেগেছিলে নাকি?'

'জেগেছিলাম, বুঝতে দিইনি। এখন একটা চুমু খান, আমাকে নিন আপনি।'

'কি বলছ কি?'

'আপনিই তো আমাকে জাগিয়েছেন, চুমু খেয়েছেন।'

'সে কথা দিয়ে তুমি কী বুঝেছ?'

'আপনার প্রতি আমার সমর্থন আছে। আপনার আসক্তি বুঝেছি।'

'যাও সরে যাও।' বাঁ হাত দিয়ে ঠেলে দেয় জাসমিনকে সাহিল, বেরোবার পথ করতে।

আর জাসমিন হাতের ঠেলায় দরজায় চৌকাঠে পড়ে যায়। আহত সিংহীর মতো গরজে ওঠে, 'ভীরু, কাপুরুষ!'

৭. সেই নারী কোথায়?

একটা পাখির ডাকে ঘুম ভেঙে যায় সাহিলের। মনে হল পাখিটা যেন তাকে ডাকছে। ভোর হয়েছে, চারদিকে ভোরের আলো ছড়িয়ে পড়েছে। ফাহমিদা, ছেলেমেয়ে জাসমিন সকলেই ঘুমিয়ে আছে। পাখিটা অবিরত ডেকে যাচ্ছে। যেন তাকে আমন্ত্রণ করছে, ঘরের বাইরে যেতে বলছে। ওই অবস্থায় পোশাক বদলায় সাহিল। চটি পরে

নীচে নেমে আসে। খিল খুলে বাইরে বেরিয়ে আসে। পাখিটা তখন কোনো একটা গাছে, ডেকে উড়ে যায়, উড়তে উড়তে ডেকে যায়, সেই ডাকের দিকে তাকে যেতে আমন্ত্রণ করছে।

পাখির শব্দ খুঁজে খুঁজে যেখানে পৌঁছয় সাহিল, সেই কালভার্টের আগের বাঁক পাট্টা দেওয়া দরিদ্র পাড়াটা, যারা রাস্তার ধারেই বসবাস করছে। এখানেই আসতে চেয়েছিল সে ঘুম থেকে উঠে। শুধু পাখির ডাকটা তাকে ঘুম থেকে একটু আগে তুলেছে। আর পাখির ডাক তাকে নিয়ে এসে ফেলেছে এখানে, যেখানে তার নিজেরই আসার পরিকল্পনা ছিল।

আর সে এখানে থমকে দাঁড়াল, আর পাখির ডাকটা পুবের গাছগাছালি ছাড়িয়ে দূরে চলে গেল। একরকম মিলিয়েও গেল।

নিশারের কথা মতো বাড়িটাকে চিনতে পারছে সাহিল। এ বাড়িতেই সেই অপরূপা সুন্দরীর দেখা পেয়েছিল, যে তিনটি চুমু খেয়েছিল তার ঠোঁটে। বাড়ি না বলে কুঁড়েঘরই বলা ভালো। আর এ ঘরে এখন সন্ধান নিতে এসেছে সে সেই সুন্দরীর। এ বাড়িতে নাকি সেই সুন্দরী নেই, এমনটা বলেছিল নিশার, আর বিশ্বাসও করতে বলেছিল। সাহিলের তাতে বিশ্বাস হয়নি। তার স্মৃতি তার সঙ্গে এরকম বিশ্বাসঘাতকতা করবে, কল্পনা করতে পারেনি। তাকে খুঁজতেই হবে সে রমণীকে, খুঁজে যেতে হবে যতদিন পর্যন্ত না পায়।

তার মন বলছে আছে সে রমণী। খুঁজবে, খুঁজে খুঁজে হয়রান হলেও খুঁজবে। এ বাড়িতে না থাকুক দশ পাঁচটা গ্রামে তো সে থাকতে পারে, যেহেতু তার সঙ্গে সেদিন দেখা হয়েছিল। তার কি এই নারী-সন্ধানে যাওয়া ঠিক হচ্ছে? তার জীবনে নিষেধ আছে জানে, কিন্তু না গিয়েও পারে না। খুঁজতেই হবে, খুঁজে যেতেই হবে। খুঁজে পেলে সে যে কী করবে, এখন জানে না। তখনকার সিদ্ধান্ত তখন নেওয়া যেতে পারে। এখন খোঁজার কথা, এখন শুধু খুঁজে যাবে। এখন তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করার বাসনা জন্মেছে, সাক্ষাৎ করবে।

তার প্রেম ছিল, প্রেমের আর্তিতে চুম্বন করেছিল তিনটি, প্রেমে সে ধরা দেবেই। এটা একতরফা প্রেম নয়, তাহলে চুম্বন করত না। সাধ ছিল রমণীর। বাসনার ব্যবহার জানে। চমৎকার তার ভঙ্গি, চমৎকার তার রূপ। চকিতে দেখার ভিতর সম্পূর্ণ করে তাকে বুঝেছে। একটা প্রেমের নিবেদন ছিল তার ভঙ্গিতে।

পেছন ঘুরে বাড়ির প্রবেশের দিকে যায় সাহিল একটা ছোটো গলি পেরিয়ে। বাড়ির সামনে চিলতে উঠোন। সেখানে একমাথা শনের মতো সাদা চুল নিয়ে এক বৃদ্ধা উনুন লেপাপোঁচা করছে। তাকে ঢুকতে দেখে মুখ তুলে তাকাল। কিন্তু নিশ্চিন্তে মুখ নামিয়ে নিল। তার আগমনে খুব একটা চমকায়নি বৃদ্ধা। তার মানে সে আসতে পারে, এটা বৃদ্ধার জানা ছিল? হয়তো তাকে চিনতেই পারেনি, এত বড়মানষি তার ঘরে আসছে, জানতে পারলে ভ্যাবাচ্যাকা খেত, শশব্যস্ত হত। অথচ তাকে চোখ

তুলে লক্ষ করেছে।

কাছে গিয়ে সাহিল গলা খাকারি দেয়।

বৃদ্ধা মুখ তোলে আবার।

সাহিল প্রশ্ন করল, 'চিনতে পারছ?'

'কেন চিনতে পারবুনি, বড়মানষি!'

'ও চিনেছ তাহলে?'

'কে চেনে না আপনাকে? আর গত পরশু রাতে—'

'ও চিনেও তুমি—'

কাদা হাতে ধীরেসুস্থে ঘরের ভিতর চলে যায় বৃদ্ধা, একটা ছোটো টুল বসিয়ে দেয় উঠোনে। 'বসুন, তা কী মনে করে?'

'এমনি কি আসতে নেই? আর সেদিন রাতে'—

'বেশিক্ষণ তো থাকেননি, একটু পরেই নিয়ে চলে গেল।'

'হ্যাঁ, আমি অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলাম। কিন্তু একটা খটকা'—

'কোনো সওয়াল আছে?'

'হ্যাঁ, এ ঘরে কি তুমি একা থাক?'

'একাই তো।'

'তবে যে এ ঘরে সেদিন দ্বিতীয় কোনো নারীর উপস্থিতি পেয়েছিলাম।'

'ভুল, ভুল টের পেয়েছিলেন। আপনি অচৈতন্য অবস্থায় ছিলেন, ভুল টের পাবারই কথা'।

'আবার প্রশ্ন করছি, সত্যিই কি এ ঘরে অন্য কোনো নারী থাকে না?'

'মিথ্যে বলছি?'

'না।'

'যাচাই করেই আসুন না ঘরের ভিতর গিয়ে।'

'না, অতটা করতে পারব না। তবুও বিশ্বাস আছে, এ ঘরে আমি কোনো নারীর উপস্থিতি পেয়েছি।'

'নিশ্চয় সে খুব সুন্দরী?'

'হ্যাঁ।'

'আর অল্পবয়সী?'

'হ্যাঁ।'

'আর খুব সাজগোজ করেছিল?'

'হ্যাঁ, তার সন্ধান দাও, ইনাম পাবে।'

'অচৈতন্য অবস্থায় মানুষ এমনই দেখে থাকে।'

'তুমি যদি তার সন্ধান জানো, বলো?'

একগাল হাসে বৃদ্ধা, 'আমাকেই ভুল করে—'

হাত ওঠে সাহিলের, 'কি বলছ কি! সে আমাকে তিনটি চুমু খেয়েছিল। তুমি কি খেয়েছিলে?'

'না।' ঘাবড়ে যায় বৃদ্ধা।

'ভান করো না, সত্য লুকিও না।'

বৃদ্ধা ঢোক গিলতে থাকে। তোতলায়। তাতে সাহিলের বৃদ্ধার প্রতি সন্দেহ বাড়ে। যেন কোনো কিছু গোপন করছে। নারীটিকে এই বৃদ্ধা লুকিয়ে ফেলেছে হয়তো।

সাহিল বলল, 'চল, ঘরের ভিতরটা দেখব।'

বৃদ্ধা ঘাড় নেড়ে বলল, 'হ্যাঁ চলুন।'

বৃদ্ধা আগে আগে যায়, পরে পরে সাহিল যায়। ঘরের চার কোণ, তক্তপোষের তলা, বাক্স প্যাটরার পেছন সবকিছু আঁতিপাঁতি করে দেখেও সেই নারীটিকে পেল না সাহিল। উপরন্তু বৃদ্ধার চোখে হাসি ও চতুরতা দেখল। নারীটিকে না পাওয়ার জন্য নিশ্চয়ই বৃদ্ধার কোনো কারসাজি আছে। ঘর থেকে সহজে বেরোতে চাইল না সে। খুঁটিয়ে ঘরের জিনিসপত্র দেখছে। দেওয়ালে আঁটা আরশি দেখল। বৃদ্ধাকে প্রশ্ন করল, 'আয়না তোমার কী দরকার হয়?'

'কেন সাজি।'

'ইস্।'

'আমিই গত পরশু সেজেছিলাম।'

'কিন্তু চুমু তিনটি তুমি—'

'না না না, ও আপনার মনের ভুল।'

'আর এই যে বাহারি শাড়িগুলো, এগুলো কে পরে?'

'আমি পরি।'

'তুমি তো বিধবা বৃদ্ধা মানুষ।'

'শখ করে রেখেছি।' হাসছে।

'হাসছ যে?'

'হাসি পেল তাই।'

'এমনি কেউ হাসে?'

'গরিব মানুষ, এমনিতেই হাসি পায়। আপনার সন্দেহ দূর হল?'

'না।'

এবার অট্টহাস্য করে ওঠে বৃদ্ধা।

সেই হাসিতে আরও সন্দেহপ্রবণ হয়ে ওঠে সাহিল। সে নিশ্চিত যে নারীটিকে লুকিয়ে ফেলেছে এই বৃদ্ধা। তাতে কী লাভ বৃদ্ধার? ইনাম তো পেত। আর তারা প্রেম-সম্ভাষে যেত। আর কিছু নয়। বাইরে বেরিয়ে আসতে শুনতে পেল পুব দিক থেকে ভেসে আসছে সেই পাখির ডাকটা।

৮. নারীটি ছোটো আলোর ছায়ায় লুকিয়ে পড়ে।

রাতে যখন রিজি দেওয়ালের গায়ে গাঁথা আরশির সামনে দাঁড়িয়ে সাজছিল, তখন আসুরা নানি তাকে বৃত্তান্তটা বলতে শুরু করেছিল। আর রিজি হাসিতে ফেটে পড়ছিল। বড় মানুষটা তাকে খুঁজতে এসে খুঁজে পায়নি। সব খুঁজেছে, বাক্স-প্যাঁটরার পেছন পর্যন্ত।

রিজির যেন স্বপ্ন-আচ্ছন্নতা আসে। কোনো কিস্‌সার ঘটনা ঘটছে তাকে কেন্দ্র করে। কোনো রাজকুমার ঘোড়ায় চড়ে তারই সন্ধান করে চলেছে। তাকে খুঁজে পায়নি, নিজেকে সে খুঁজেও দেয়নি। রাজকুমারের কাছে ধরা না দিয়ে সে লুকিয়ে থাকছে। যে রাজকুমার তাকে ভালোবাসে, আর সেই রাজকুমারকে সে ভালোবাসলেও, নিজে যে দরিদ্র, এই অভিমানে রাজকুমারের কাছে ধরা দিতে চায় না, তাতে তার মান যাবে।

আসলে রিজির একা একা রাতে সাজগোজ করার কারণ, সে দিনের বেলা উলিডুলি শাড়িতে থাকে। তার রূপ আছে, কিন্তু তার রূপ প্রকাশের কোনো সুযোগ থাকে না। রাতে তাই সাজে। কেননা পেশায় সে ভিখিরি। সে ভিক্ষে করে নিয়ে এলেই তার আর নানির দিন গুজরান হয়। নানি কিন্তু ভিখিরি নয়। রিজির মায়ের বিয়ে হয়েছিল কয়েকটা গ্রাম পরে গদি গ্রামে। গদির পেশাদার ফকিরের সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল। বারো তেরো বছর আগে রিজি যখন বালিকা তখন মা-বাবা কলেরায় একইসঙ্গে মারা যায়। রিজি বিধবা নানির কাছে ফিরে আসে। রিজির বাবা ঠাকুরদা পরদাদা যে-সে ফকির ছিল না, নামজাদা ফকির ছিল। তারা ঘোড়া নিয়ে জরির পোশাক পরে গান গেয়ে খানদানি ফকিরের বেশে ভিক্ষে করত।

পেশাদার ফকির বংশ আজ লোপ পেয়েছে। ভিটে-মাটি সব গেছে। রিজি সেই বংশের সুন্দরী যুবতী। কিন্তু সে ভিক্ষাবৃত্তি ছাড়তে নারাজ। সেই পেশাকে টিকিয়ে রাখছে। নানির বাড়িতে নানির সঙ্গে থাকে। আর রাতের অন্ধকার থাকতে বেরিয়ে পড়ে ঝুলি কাঁধে দূর গ্রামে। আশপাশের গ্রামে কখনো ভিক্ষে করে না, দূরে, দূরের গ্রামে চলে যায়। তার এই ভিক্ষাবৃত্তিকে টিকিয়ে রাখবে বলে, নিজের রূপ থাকলেও রূপকে লুকিয়ে রাখে উলিডুলি পোশাক পরে, কেউ তার রূপ দেখে যদি আসক্ত হয়, তাকে বিয়ে করতে হবে, তাহলে সে ফকিরি ঐতিহ্য টিকিয়ে রাখতে পারে না। কেন না তার রূপ দেখে অবস্থাপন্ন কেউ বিয়ে করলে, সে তো আর তাকে ভিক্ষে করতে যাওয়ার অনুমতি দিত না!

আর ভিক্ষে করে বলেই, উলিডুলি শাড়ি পরে, আর তাতে রূপ ঢেকে যায়। তাই রাতে ফিরে ভালো পোশাক পরে, আর সাজগোজ করে। দৈনন্দিন এই আচরণে অভ্যস্ত হলেও পুরুষসাধ কি তার হারিয়ে যায়? যায় না। যে অচৈতন্য পুরুষটিকে সে বিছানায় পেয়েছিল, তাকে স্পর্শ করা ও চুম্বন করার সাধ জেগেছিল, যেহেতু পুরুষটি ছিল অচৈতন্য, চুম্বনের দায় নিতে হবে না তাকে।

কিন্তু পুরুষটি টের পেয়ে গিয়েছিল। তৃতীয় চুম্বনের সময় আচ্ছন্নদশায় একবার চোখ মেলে দেখেছিল, তাকে দেখেছিল, তার রূপ দেখেছিল। এতে খুশি রিজি। কিন্তু পুরুষটির কাছে কিছুতেই ধরা দেওয়া যাবে না। আজ ভোরে যখন ও রাতের অন্ধকার থাকতে থাকতে দূরের গ্রামের উদ্দেশ্যে ভিক্ষে করতে বেরিয়ে গিয়েছিল সে, সেই মুহূর্তে সেই বড়মানুষটা এসেছিল তাদের ঘরে, তারই সন্ধানে। আর নানিও শুলুক ভাঙেনি। ঘর দোর আঁতি-পাঁতি করেও খুঁজে পায়নি তাকে। বেশ হয়েছে, সেই কথাতে নানি-নাতনি খুব হাসে। তাতে রিজির কাজলরেখা বেঁকেও যায় না।

আসুরা নানি বলল, 'তোর ব্যাপারে খুব সওয়াল করছিল।'

'তা তো করবেই। কেমন দেখলে মানুষটাকে?'

'বেশ।'

'বয়স একটু হয়েছে।'

'বড় মানুষের আবার বয়স! তোর জন্য পাগল বুধয়।'

রিজি খিল খিল করে হাসে।

'হাসছিস যে?'

'হাসি পেল তাই হাসছি।'

দরজায় হঠাৎ কড়া নড়ে উঠল।

রিজি ফিসফিসিয়ে বলল, 'ওই, কে এল দেখ।'

আসুরা মুখে আঙুল দিয়ে হিসিয়ে ওঠে, 'সেই বুঝি বড় মানুষটা।'

'কী করি?'

'ছোটো আলো আছে তার ছায়ায় চলে যা ঘরের কোণে। আমি দরজা খুলছি।'

রিজি লুকিয়ে পড়ে ছোটো আলোর ছায়ায় ঘরের কোণে।

আসুরা দরজা খোলে। বড় মানুষটার মুখ।

সাহিল কড়া ভাষায় প্রশ্ন করল, 'কার সঙ্গে কথা বলছিলে এই ঘরে? ঘরে আর কেউ নেই যে?'

'নিজের সঙ্গে নিজে কথা বলছিলাম। উঁকি মেরে ঘরের ভেতরটা দেখুন, দ্বিতীয় জনপ্রাণী নেই। একা বুড়োমানুষ দোকলা পাব কোথায়। সেই কতকাল আগে বিধবা হয়েছি।'

সাহিলের কেমন বিশ্বাস হয় না। উঁকি মেরে দেখে, সত্যিই ঘরের ভিতর আর কেউ নেই। অথচ বাইরে থেকে বৃদ্ধাকে কারো সঙ্গে কথা বলতে শুনেছিল। নিশ্চয় বৃদ্ধা নিজের সঙ্গেই কথা বলে। আজ নিশারকে বড় রাস্তায় ছেড়ে দিতে বলেছিল। একটু হাঁটতে চায় সে, পৌনে এক কিলোমিটার পথ তো, দিব্যি হাঁটতে পারবে, এতে শরীর ভালো থাকবে, নিশারকে বুঝিয়েছিল সাহিল। কিন্তু তার মতলব ছিল। চুপিচুপিই এসেছিল এ ঘরের দরজায়। কিন্তু সে নারীকে এই ঘরে দেখতে পেল না। বড় হতাশ হল সে।

কিন্তু এও জানে, সে নারী আছে, তার থাকার ভিতর কোনো রহস্যময়তা আছে, যা তাকেই নিরসন করতে হবে। বিফল মনে ফিরে যায় সে।

একটু পরেই আসুরা দরজা বন্ধ করে দেয়। এবার তারা দুজনে দুজনকে জড়িয়ে ধরে নিঃশব্দে হাসে। যেন ভীষণ একটা কঠিন লড়াইয়ে জয়লাভ করেছে। কিন্তু সাহসের অভাব হয় সরব আনন্দ করতে।

আসুরা শুধল, 'তুই কি ধরা দিতে চাস?'

'না। কক্ষনো না।'

'মনে হচ্ছে আবার আসবে।'

'আবার আসবে?'

'বার বার আসবে। তোর রূপে মজেছে।'

'আমার চুমু খাওয়াটা ঠিক হয়নি। তোমার উৎসাহ পেয়েই'—

'তোর ইচ্ছে জানি বলে উৎসাহ দিয়েছিলাম।'

'আমার ইচ্ছে তুমি সত্যিই জানো?'

'তোর মাথায় কাঁচা চুল, তা দিয়ে তোকে অনেকটা পড়তে পারি।'

'আমি ধরা দিতে চাই না কিন্তু।'

'তাও জানি।'

'লোকটা বড়লোক হল কেন, ওকে এ ঘরে রাখা যেত না? আমি ভিক্ষে করে খাওয়াতাম'।

'প্রেমে পড়েছিস?'

কিছু বলে না রিজি, জানলার বাইরে জোৎস্নার দিকে তাকিয়ে থাকে, শুধুই তাকিয়ে থাকে।

৯. একজন বালক বলল, 'সে তো সুন্দরী!'

পোশাক পরে গভীর রাতেই তৈরি ছিল সাহিল। বারান্দায় চেয়ারে বসেছিল। শালি গতকাল রাত থেকে ঘরের দরজা খুলে রেখে শুচ্ছে। এটা তার ভালো লাগেনি। এই প্রলোভনের কাছে থেকে রাতে গাঢ় ঘুমে বিঘ্ন ঘটে।

রাত দুটোর সময় ঘুম থেকে উঠে পড়েছিল। তারপর বারান্দায় চেয়ার নিয়ে বসে পড়েছিল। রাতের শব্দ শুনছিল, রাতের রূপ দেখছিল। একসময় বসে বসেই ঘুমিয়ে পড়ে। ঘুম ভাঙল সেই পাখির ডাকে। যখন ভোরের ভিতর খানিকটা রাত লেগে আছে। অমনি সে নেমে আসে নীচে। পাখির ডাক অনুসরণ করে চলতে থাকে। এগিয়ে যায় রাস্তা ধরে। আর সেই নারীর উদ্দেশ্যে যে কুঁড়ে ঘরে ছিল, সেখানে পৌঁছতেই থেমে যায় সাহিল। তখন পাখির ডাকটা উড়ে উড়ে চলে যায় আরও পুবের দিকে।

সেই ঘরটির পাশের বাড়ির উঠোনে এক কিশোর নিম দাঁতন দিয়ে দাঁত মাজছিল

দেখতে পেল সাহিল। আর সেই বাড়ির উঠোনে বৃদ্ধা ঝাঁট দিচ্ছিল নুয়ে নুয়ে।

বৃদ্ধাকে আড়াল করে কিশোরটির কাছে এগিয়ে যায় সাহিল। তাকে হঠাৎ প্রশ্ন করল সাহিল, 'আচ্ছা তুমি কি জান পাশের বাড়িতে একজন কমবয়সী মেয়ে থাকে?'

'হ্যাঁ থাকে, দেখতে খুব সুন্দরী।'

'ওকে দেখতে তোমার বুঝি খুব ভালো লাগে?'

'ভালো লাগে। আমি প্রতিদিন সকালে দেখি, তাই ঘুম থেকে তাড়াতাড়ি উঠি।'

'এখন কি সে এ বাড়িতে আছে?'

'নেই।'

'কোথায় আছে?'

'একটু আগেই বেরিয়ে গেল। পুবদিকে।'

'ওই পাখিটা যেদিকে ডেকে ডেকে চলে গেল?'

'হ্যাঁ হ্যাঁ।'

'সেই সুন্দরীর নাম কী?'

'রিজি।'

'সে এখন কোথায় গেল?'

'গ্রামে গ্রামে।'

'কেন?'

'ভিক্ষে করতে। তারপর রাতে এসে সাজবে।'

'ভিক্ষে করে নাকি?'

'ওতো ভিখিরি।'

সেই সুন্দরীর পরিচয় পেয়ে আহতই হল সাহিল। সে কি না ভিখিরি, ভিক্ষে করে বেড়ায়? একটু দ্বন্দ্ব এল মনের মধ্যে। কিন্তু প্রেম, প্রেমই, তার কোনো বাছবিছার থাকতে নেই। সে বড়লোক বলে তার অহঙ্কার থাকবে কেন? উচ্চ নীচ ভেদ নিয়ে সে নীচতা করতে পারে না। তাকে ভালোবাসতেই হবে, ভালোবেসে যেতেই হবে। বরং এটা একটা দৃষ্টান্ত, সে বড়লোক এক ভিখিরির সঙ্গে প্রেম করে। এটাতে সে বাধ্য। যেন সে নিয়তিতাড়িত। অথচ তাকে তেমন করে কখনো দেখেনি, কোনোদিন তার সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়নি। তার আত্মসম্মানবোধ এতই প্রবল যে আশপাশের গ্রামে ভিক্ষে করে না! আর ভিক্ষে করতে যাচ্ছে, কেউ দেখে ফেলবে বলে রাতের অন্ধকার থাকতে থাকতে সে গ্রাম ছেড়ে অন্য গ্রামে পৌঁছে যায়। আর পুরুষের লোভের চোখে পড়বে বলে অতিসাধারণ পোশাকের আড়ালে তার রূপযৌবন লুকিয়ে ফেলে।

সেই পুব দিকের রাস্তা ধরল সাহিল। মেয়েলোকের হাঁটা মন্থর হয়, নিশ্চয় হেঁটে গিয়ে ধরে ফেলা যায় সে রমণীকে। সেজন্য সে জোরে জোরে হাঁটছিল। গ্রাম থেকে বেরিয়ে সচরাচর মানুষজন যে পথে যায়, এটা সে পথ নয়। গ্রামের পেছনের পথ,

অবহেলায় দীনহীন। এবড়ো খেবড়ো মেটে রাস্তা। আর রুক্ষ মাটি। দুপাশে ঝোপঝাড়। কাঁটাওয়ালা বাবালা গাছই বেশি। এসব কেউ লাগায়নি, আপনা আপনি হয়েছে। এই পথে চলতে নিশ্চয় সে রমণীর খুবই কষ্ট হয়। তাছাড়া তো অন্য পথে যাওয়ার তার উপায় নেই।

গ্রাম থেকে বেরোনো পেছনের পথ এটা একমাত্রই। আর ভাঙা পথ, উঁচু-নীচু পথ। চাষির গরু নিয়ে যাওয়ার পথ। চারপাশে ঝোপঝাড়। কীটপতঙ্গের গুঞ্জন থাকে। থাকে মৌমাছিদের গুঞ্জন। এ পথেই সেই রমণীর গমনাগমন ঘটে থাকে।

হাঁটতে হাঁটতে সাহিল পৌঁছে যায় দামোদর নদের গায়ে। এখানে পারাপারের খেয়া আছে। পেরিয়ে যেতে হবে তাকে ওপার। পারাপারের নৌকোতে কোনো মেয়েলোক নেই, নিশ্চয় আগের পাড়িতে গেছে। কিন্তু সত্যিই কি কোনো মেয়েলোক এ পথ দিয়ে গেছে? সামনে ছিল এক কুমোরের বাড়ি। বৃদ্ধ কুমোরটি চাকে বসে কাদা হাতে চাক ঘুরিয়ে কলসি বানাচ্ছিল। পথের ধারেই তার কুমোরবাড়ি। সে দেখে থাকতে পারে।

কাছে এগিয়ে যায় কুমোরের। শুধোয়, 'আচ্ছা, একটু আগে এপথ দিয়ে কি কোনো মেয়েলোক গিয়েছে?'

বৃদ্ধ বলল, 'আমার পিঠে একটা মাছি কামড়াচ্ছে, সরিয়ে দাও তো বাপু, একটু আরাম পাই। কতক্ষণ ধরে কামড়াচ্ছে? তারপর বলছি।'

বৃদ্ধ কুমোরের পিঠে সত্যি একটা নীল মাছি বসেছিল, হাত বুলিয়ে তাড়িয়ে দেয় সাহিল মাছিটাকে।

বৃদ্ধ বলল, 'আহ্, আরাম পেলাম।' মুখ ফিরিয়ে চাক ঘোরা অবস্থায় শুধল, 'কোন্ মেয়েলোকের কথা শুধাও তুমি।'

'আজ্ঞে একজন অল্পবয়সী মেয়ে, সুন্দরী, যে কিনা ভিন গাঁয়ে ভিক্ষে করতে যায়।'

'সুন্দরী বলছ কেন তাকে।'

'সুন্দরী নয়?'

'সে একজন পাগলিঝাগলি ছেঁড়াখোঁড়া ময়লা পোশাক পরে থাকা মেয়েলোক। ভদ্দরলোকেরা পাড়িতে উঠলে সাজু মাঝি নৌকোতে তোলে না। পরের খেয়ায় সাজু তখন একা মেয়েলোকটাকে পার করে দেয়। কোনোদিন পারানি নেয় না, দাবিও করে না। ভিখিরি একজন মেয়েলোক, তাকে সুন্দরী কেউ দেখেনি।'

সাহিল বলল, 'সে কোন্ গ্রামের দিকে গেছে বলতে পারো?'

'যাও সাজু মাঝিকে শুধোও গিয়ে। প্রতিদিন বিনা কড়িতে পারাপার করাতে হয় বলে গালাগাল দিয়ে থাকে, আবার ভালোবাসাও আছে, ফেলে রেখে দেয় না ওপারে।'

খেয়াঘাটে বাবলাগাছের নীচে বসে বসে বিড়ি ফুঁকছিল সাজু মাঝি। মেয়েলোকটির

গন্তব্য জানতে চাইলে ওপারের চরের এক রাখাল বালককে আঙুল উচিয়ে দেখায়, 'ও জানে। ওর সঙ্গে তার খুব ভাব। প্রতিদিন সকাল-সন্ধ্যায় দুজনের দেখা হয়ই। ছোঁড়ার নাম মধু। খুব ভালো ছেলে।'

খেয়ায় তুলে মধুর কাছে নিয়ে যায় সাজু মাঝি। ওপারে মধু দামোদরের চরে একপাল গরু চরাচ্ছিল। তার কোমরে একটা গামছা বাঁধা, হাতে বাঁশনি বাঁশের লাঠি।

মধুকে শুধল সাহিল, 'কোথায় গেছে সেই মেয়েলোক, যাকে সবাই দূরছাই করে, ময়লা ছেঁড়া পোশাকে থাকে, তেমন রূপও নেই তার?'

'কার কথা বলছ, রিজি ভিখারিনির কথা?'

'হ্যাঁ, তার নাম রিজি।'

'সে তো সুন্দরী!'

'তুমি জানো?'

'আমাকে জানিয়েছে।'

'আজ কোন্ গ্রামে গেছে সে?'

'আমি জানি সে কোন্ গ্রামে আজ গেছে, এ কথা তোমাকে কে বলল?'

'সবাই জানে, সবাই বলল।'

'সবাই জানে?'

'হ্যাঁ।'

একটা গর্বের হাসি হাসল মধু রাখাল। বলল, 'রিজি আজ ছ-আনি গেছে।'

'তোমাকে বলে যায়?'

'হ্যাঁ, ফেরার পথেও দেখা করে যায়।'

'তোমাকে বুঝি সে খুব ভালোবাসে?'

'জানি না। আমি খুব ভালোবাসি।'

সাহিল কিছু বুঝল যেন। পাশের বাড়ির কিশোর যেমন, তেমন এই বালকও সেই সুন্দরীর প্রেমে পড়েছে। তাদের প্রেমিকা যুবতী, তারা কিশোর, বালক।

সাহিল ছ-আনি গ্রামের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়ল তখনই। ছ-আনি গ্রামে ঘুরে বেড়াল সাহিল, জানতে পারল সেই ভিখারিনি এসেছে। কিন্তু পথিমধ্যে কিছুতেই সেই সুন্দরীর সঙ্গে সাক্ষাৎ ঘটল না সাহিলের।

১০. ফকির বংশের শেষ ঘোড়া সেদিন মারা গিয়েছিল।

রিজি জানে সে যখন ভোরের বেলা বেরিয়ে পড়ে ভিক্ষে করতে ভিন গ্রামের উদ্দেশ্যে, তখনও ভোরের গায়ে রাতের অন্ধকার কিছু লেগে থাকে। আর পাখিরা গাছের বিশ্রাম ছেড়ে সেই পুবের আলোর দিকে উড়ে যায়। তার বেরিয়ে পড়ার সময়েই নির্দিষ্ট একটা পাখি পশ্চিম থেকে উড়ে আসে, আর তার সঙ্গে যায় কিছুদুর

পর্যন্ত। অনেক পরে তার ডাক মিলিয়ে যায়। ভোরের এই ভিজে হাওয়া বড় পছন্দ রিজির। পুবের দিকেই যায়, আলো এগিয়ে আসে তার দিকে, সেও আলোর দিকে এগিয়ে যায়। অনেক সময় এই ধন্দে পড়ে সে আলোর কাছে আগে গেল না, আলো তার কাছে আগে এসেছে। এই কথা মনে আলোড়িত হলে, একমাত্র বালক মধু রাখালের সঙ্গে আলোচনা করতে পারে। মধু রাখাল বড়ই সহজ ও স্নিগ্ধ। কোনো কথায় তারা কিছুটা সময় কাটায়।

আর গ্রামের এই অবহেলিত পেছনের পথটা তার ভারী পছন্দ। সামনের পথে গাড়ি ঘোড়া, বেশি লোকজন। এ পথ তেমনই নির্জন। ভোরে যে সে খেয়া ঘাটে পৌঁছয়, এই খেয়াঘাট ও তার লোকজন তার খুব প্রিয়। মানুষজনেরা তাকে অবহেলা করে, তিরস্কার করে, আবার মনে মনে ভালোবাসেও। এই যেমন সাজু মাঝির খেয়ায় উঠতে গেলেই সাজু মাঝি হা হা করে ওঠে, ভালোবেসে একটু শাস্তি দেয়, দাঁড় করিয়ে রাখে। পারানি চায় না কখনও। বৃদ্ধ কুমোরের কাছে দাঁড়ালে খেঁকিয়ে উঠবে প্রথমে, তারপর প্রশ্রয়ও দেবে। কেউ কেউ কোনো কোনোদিন একটা কিছু উপহার দেয়ও। একটা পাকা আতা, কিংবা একমুঠো জাম। কুমোর কানকা ভাঙা রঙ করা মাটির হাঁড়িও উপহার দেয়।

ওদের এই দূরছাই ভারী পছন্দ রিজির। বেশ সখ্য আছে তাতে। এক পারিবারিকতার গন্ধও। কেউ তাকে রূপসী দেখে না। আর এমনিতেই তো সে ছেঁড়াখোড়া ময়লা পোশাকে থাকে, সম্পর্কে অবহেলার মেয়ে, তার আবার রূপ কোথায়? এখানে তাই স্বচ্ছন্দ রিজি।

গতরাতে সেই মানুষটা এসেছিল, যে কি না একদিন রাতে তাকে রূপসী ঠাওরেছিল, আর সে কি না ঘরের ভিতরই, ঘরের ছোটো আলোর ছায়ায় লুকিয়ে পড়েছিল। আগের দিন রাতে অচৈতন্য ঠোঁটে তিনটি চুমু খেয়েছিল। যাকে চুমু খাচ্ছে, সে যদি টের না পায়, তার চুমু খাওয়ার অপরাধটা থাকত না, চুমু খাওয়ার সম্পর্কের দায়ও এসে পড়ত না। কিন্তু মানুষটা তৃতীয় চুম্বনটা চোখ মেলে দেখেছিল। ফলে সে চোখে পড়েছে সেই পুরুষের। চিহ্নিত হয়েছে তার রূপ। তার রূপ জানাজানি না হয় সেজন্য তার অসীম কাঙালপনা। কেন না সে ভিক্ষাবৃত্তির জীবন নিরবচ্ছিন্ন রাখতে চায়, সেখানে কোনো ছেদ ঘটুক সে চায় না। সেজন্য সে বিয়ে করবে না। তার বাবা-মা, তার বহু পূর্বপুরুষ ফকির ছিল, ভিক্ষে করেই বেড়িয়েছে। সেখানে দৈন্যের এক অহঙ্কার ছিল। মানুষের দীনতার খুব প্রয়োজন আছে। মনে মনে এই দর্শনকে রিজি একভাবে জানে। কিন্তু মনুষত্বের আভিজাত্য নিয়ে তারা বেঁচে গেছে। ভিখিরি বলে সামান্য মানুষ নয় তারা। গলায় থাকে বহু মূল্যবান রত্নের মালা, যা সংগ্রহ করা হয়েছিল দেশ বিদেশ থেকে। সেই রত্নরাজির মধ্যে ইতিহাস ও সভতার স্পর্শ ছিল।

আর তার পূর্বপুরুষরা ঘোড়া নিয়ে ভিক্ষে করতে যেত। রিজি তার শৈশবেও

ঘোড়া দেখেছিল, বাবা নিয়ে যেত ভিক্ষে করতে। কিন্তু খুবই দুর্বল সে ঘোড়া। ঠিক মতো দানাপানি দিতে পারত না বলে হাড় জিরজিরে হয়ে পড়েছিল। তার চোখের সামনের ঘোড়াটা মারা যায়, ফকির বংশের শেষ ঘোড়া সেদিন মারা গিয়েছিল।

আর ফকির বিদ্রোহের সময় এই ভিক্ষে করা পেশাদার ফকিররা ঘোড়া নিয়ে বিদ্রোহে নেমে পড়েছিল ইংরেজ সৈন্যদের বিরুদ্ধে। যাদের কিছু নেই, সেই নিঃস্ব মানুষরা এই বিদ্রোহ করেছিল। তাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছিল ভিক্ষুক ফকিররা। সে ছিল ভীষণ সংগ্রাম। সে তো ইতিহাস।

সে ঘোড়া গেছে রিজির। বাপ ঠাকুরদারাও কবরে শুয়ে আছে। কিন্তু ইতিহাস রয়ে গেছে, রয়ে গেছে সেই দর্শন। রিজি ভিক্ষে করে, বংশের দর্শন জারি রাখতে চায়, আগলে রাখতে চায়। তার এই রূপ নিয়ে; রূপকে যথাবিহিত কাজে না লাগিয়ে ভিক্ষাবৃত্তিতে যে তার এই স্বেচ্ছা সমর্থন, এক ধরনের কৃচ্ছ্রতা, এক ধরনের জীবন উৎসর্গ মনে করে রিজি। এই রূপ তাই তাকে আড়াল করতে হয়, অবহেলার জীবন তৈরি করতে হয়। সেদিন রাতে পুরুষের লোভজনিত মুহূর্তের স্খলন তার রূপকে প্রকাশ করেছে এতদঞ্চলের সবচেয়ে ধনী মানুষটার কাছে। তার রূপ প্রকাশ হয়েছে। সে জানে তার প্রতি মানুষটার এই রূপজ মোহকে ঘৃণা করে রিজি। তাই খেয়াঘাটের মানুষজন তার এত প্রিয়। এরা কেউ তার রূপ দেখেনি, বরং অবহেলা করে, শাস্তি দেয়।

ঘোড়াগুলো মরে গেল সব। রিজি চোখের সামনে দেখতে পায়, শেষ ঘোড়াটাও মরে গেল। বাবার চোখে অশ্রু। তার গলায় থাকত মূল্যবান রত্নের হার। সে সব তারা বিলিয়ে দিত গলা থেকে খুলে, প্রিয় মানুষদের উপহার হিসেবে। ভিক্ষে করতে গিয়ে নিজেই রত্ন বিলিয়ে দিত। মৃত্যুর আগে বাবা হাসান ফকির এমনটা করত। ভিখিরি বলে মূল্যবান রত্ন উপহার দিতে পারবে না? ফকির তো আসলে কৃচ্ছ্রসাধন, পার্থিব বিষয়ে তার দৈন্য। আসল তো মানবসত্তা।

মা-বাবার মৃত্যুর পর রিজি এক মুল্যবান রত্ন পেয়েছিল। বাবা যখন মরতে বসেছিল, তার সন্ধান দিয়েছিল। একটুকরো হিরে। আজও সেই হিরের টুকরোটা আগলে রেখেছে সে। এত মূল্যবান হিরে তার কাছে আছে, একথা নানি আসুরাকে সে কোনোদিন জানায়নি। তাতে লোভ জন্মাবে নানির। রত্নের প্রতি তার লোভ নেই, ঐতিহ্যের প্রতি লোভ আছে। আর সেই ঐতিহ্যের স্মারক হীরকখণ্ডটি। কীভাবে যেন গচ্ছিত হয়ে রক্ষিত হয়েছে সেই হীরক খণ্ডটি। আর রিজির হাতে এসে পৌঁছেছে। তাকে আগলে রাখে রিজি। রাতে যখন শোয় শাড়ির গিঁট থেকে খুলে বালিশের তলায় রাখে। ঘুম থেকে উঠে যখন সে ভিক্ষে করতে বেরোয়, বালিশের তলা থেকে আঁচলের খুঁটে বেঁধে নেয়।

তারপর খেয়াঘাটের ওপারে রাখল বালক মধুর সঙ্গে ভাব হবার পর তার হাতে হীরকখণ্ডটি গচ্ছিত রেখে বলে যায়, সে আজ কোন্ গ্রামে ভিক্ষে করতে যাচ্ছে।

তার ঠিকানা সে একজনকেই বলে যায়। আর সেই বালককে সে খুব বিশ্বাস করে। আর সন্ধ্যায় যখন রিজি ফেরে বালকের কাছ থেকে হীরকখণ্ডটি ফিরিয়ে নেয়। ভোরে খেয়াঘাটের ওপারে বালক কখনও কোনোদিন থাকে না, এমন হয় না, ফেরার সময়ও তার থাকার ব্যত্যয় ঘটে না।

বালক রাখাল মধু জানে তার কাছে রিজি যে হীরকখণ্ডটি রাখতে দিয়ে যায়, তা খুবই মূল্যবান। কিন্তু একথা কাউকে সে বলে না। জানে এই রত্ন ও রত্নের মূল্যের প্রতি মানুষের লোভ প্রচুর। সে বালক হলেও জ্ঞানী। সে বালক ও সৎও। এই হীরকখণ্ড হাতিয়ে নেবার কথা কখনো ভাবেনি। রিজির সঙ্গে সম্পর্কটা তার কাছে খুবই মূল্যবান। রিজির সঙ্গে যখনই দেখা হয়, তার ডান হাত দিয়ে কাঁধ ছোঁয়, চোখের দৃষ্টির আদর দিয়ে সম্পর্কে যায়। আর তার চোখে পড়েছে, রিজি সুন্দরী, অপরূপা সুন্দরী। কুমোর বৃদ্ধ, সাজু মাঝির চোখ নেই, তাদের রত্নের লোভ থাকতে পারে। সেজন্য তার কাছে যে হীরকখণ্ড প্রতিদিন রিজি গচ্ছিত রেখে যায়, সাজু মাঝি কুমোর বৃদ্ধর সঙ্গে তার এত মাখামাখি সত্ত্বেও কোনোদিন সে শুলুক ভাঙেনি।

হীরকখণ্ডটা সে প্রতিদিন গামছার খুঁটে বেঁধে রাখে। মধু হালদার মনিব বাড়িতে দুপুরে খেতে যায়, অবহেলায় গামছাটা কোমর থেকে খুলে সরিয়ে রাখে, মনিব গিন্নী গামছাটা ছুঁয়েও দেখে না, গন্ধের ভয়ে নাক সিঁটকে থাকে। আর মধুও ভুলে যায় হীরকখণ্ডটার কথা। সারাদিন যদি হীরকখণ্ডটার কথা ভাবে, কাজ করবে কখন, বাঁচবে কখন। যখন রিজির সঙ্গে সন্ধ্যায় দেখা হয়, তখনই মনে পড়ে। তখন একগাল হাসি আসে মধুর চোখে।

১১. দুটো আমড়া পেলে ভাতে দিয়ে খেতাম।

রিজি বৃদ্ধ কুমোরের কুমোরবাড়ির সামনে এসে বলল, 'কুমোরদাদা, তোমার হেতনেটায় একটু বসব নাকি? দু-একটা লোক জমেনি, সাজু মাঝি পাড়ি ছাড়বে না এখন।'

'এই আমার কুমোরবাড়ির যেখানে সেখানে বসবি না রিজি। পবিত্র থান, এতে নোংরা লাগতে দিইনি। রুজি রোজগারের জায়গা তো! আচ্ছা, দে তো পিঠটা একটু চুলকে।'

রিজি খুশি হয়, কুমোরদাদা তাকে উঠতে দিয়েছে কুমোরবাড়িতে। হাসে, আর পিঠটা চুলকে দেয়।

কুমোর বৃদ্ধ চাকে কাদা বসাচ্ছিল, উলটো দিকে মুখ করে আছে, তারও মুখে হাসি। 'পিঠে সারাক্ষণ কী যে চরে যায়। মশা মাছি পিঁপড়ে পোকামাকড়রা আমার পিঠে বসে, যখন আমার কাদা হাত থাকে। ওরা বুঝি জানে, বুঝলি?'

'ওদেরও মন আছে?'

'হয়তো তা একটু সকাল সকাল আজ এসেছিস।'
'ঘুম ভাঙল, পাখি ডাকল, চলে এলাম।'
'শাড়ির আঁচল গায়ে ঠেকাসনি যেন, যা নোংরা শাড়ি পরেছিস।'
'কেউ তো কিনে দেয় না একটা।'
'কার মহব্বত আছে তোর ওপর শুনি?'
'কেন তোমার?'
'মারব কানচাপাটিতে এক চড়। বেহুদা মেয়ে, ওর প্রতি আমার নাকি মহব্বত আছে। যমেরও অরুচি তুই।'
'তুমি যে আমাকে কানা ভাঙা হাঁড়ি কলসি দাও, পাকা রঙ করা থাকে সেগুলোতে।'
'ফেলে না দিয়ে তোকে দিই।'
'তবে যে রঙ করে তারপর দাও।'
'ওই একটু রঙ রাখি তোর জন্য।'
'তোমার ভালোবাসা জানি।'
'দূর হয়ে যা দিকি মুয়ের সামনে থিকে।'
'আর একবার পিঠ চুলকে দেব?'
'আর একবার দে।'
'তোমার রাতে ঘুম হচ্ছে?'
'কেন?'
'কদিন ধরেই জ্যোৎস্না!'
'ভারী কথার বাহার তো দেখছি! হয়েছে কিরে তোর?'
'কি আর হবে, দুটো আমড়া পেলে ভাতে দিয়ে খেতাম। তোমার গাছে ঝুলছে দেখেছি।'
'গাছের ত্রিসীমানায় ঘেঁষবি না একদম, মেরে হাড় গুঁড়ো করে দেব।'
'গাছের গুড়ন্তি ফল তো শেষবারের মতো একবার দিয়ে থাকো।'
'এখন যা দিকি, মেলা ফ্যাচ ফ্যাচ করবি না, কাজে বসেছি, আর একবার চুলকে দিয়ে সরে পড়।'
ওদিকে দু চারজন পাড়িতে যাত্রী হয়েছে, সাজু মাঝি লগি ঠেলে বেরিয়ে গেল নিষ্ঠুরভাবে, রিজির চোখের সামনে। রিজিকে দেখেও দেখল না। রিজি এই নিষ্ঠুরতার মানে বোঝে। আজ রিজিকে সাজু মাঝি একা একা পার করাবে আর বকুনি দেবে, গালমন্দ করবে। তার জন্য তৈরি হতে থাকল।
কুমোর বৃদ্ধ তার দিকে মুখ ফেরাল। 'তোর খোঁজে গতকাল এক ভদ্দরলোক এসেছিল, বলছিল তুই নাকি সুন্দরী?'
'তাই নাকি? সুন্দরী হতে যাব কোন্ দুঃখে? আমার কি খাওয়া পরার অভাব?'

'ভিখিরি আবার কী কথা বলে দ্যাখ, ওর নাকি খাওয়া পরার অভাব নেই।'

'নেই তো, ভিক্ষেতে মিটে যায়। বাড়তি কিছু চাওয়ার হলে রূপের প্রয়োজন হত।' কথা কটি বলতে বলতে ঘাটে নেমে যায় রিজি। এই কথাগুলো নিশ্চয় কুমোর বৃদ্ধকে আহত করেছে। বুঝতে পারছে, রাগে গর গর করছে। ভিখিরির এত বড় বড় কথা বলা উচিত নয়। রিজি ভাবে কুমোর মাঝি তাকে তেমন ভিখিরি মনে করে কেন? তার আঁচলে এখন মূল্যবান হীরকখণ্ড বাঁধা!

সাজু মাঝি বলল, 'উঠে পড় উঠে পড়, যত আপদ আমার ঘাড়ে।'

নৌকোটা ভিড়তে তর না দিয়ে, ওঠার ফুরসৎ না দিয়ে নৌকোটা ছেড়ে দেয়। অভ্যস্ততায় কোনোরকমে উঠে পড়ে রিজি—আজ পড়েই যেত। উঠে পড়ে সাজু মাঝির গায়ের কাছে এসে দাঁড়িয়েছে! হাওয়ায় আঁচল ওড়ে, সাজু মাঝির মুখে ঝাপট মারে।

'এই, আঁচল ওড়াচ্ছিস কেন আমার মুখে?'

'আমি কি ওড়াচ্ছি, হাওয়াকে বারণ করো না।'

'মারব এক লাথি!'

'এত রাগছ কেন আজ?'

'কেন তোকে সুন্দরী বলে খুঁজতে আসে লোক, তুই কি সুন্দরী?'

'লোকে ভুল করলে আমার কী?'

'লোকে ভুল করবে কেন? তুই নিশ্চয় তোর রূপের বড়াই করে সে লোকটার কানে তুলেছিস?'

'তাতে তোমার অসুবিধে কোথায়?'

'তোর সম্বন্ধে লোকে বাড়িয়ে বলবে কেন? এই অসহ্য আমার গায়ে বাজছে।'

'তুমি বড় ভালোমানুষ মাঝিদাদা।'

'এই আবার আঁচল ওড়ালি, আঁচলের গিঁটে আবার কিছু একটা বাঁধা, আঘাত লেগেছে আমার।'

'হিরে আছে গো, হিরে!'

'যা ভাগ! যত্তসব—'

লাফিয়ে পড়ে নামে রিজি। আর খিলখিলিয়ে হেসে ওঠে। দৌড়তে দৌড়তে যায় মধু রাখালের কাছে।

মধু রাখাল বলল, 'তোমাকে সুন্দরী বলে জানতে পেরেছে একটা লোক।'

'আমি জানি।'

'তোমার খোঁজে সে লোকটা এসেছিল গতকাল।'

'আমার ভিক্ষের সময় জুড়ে লোকটা আমার পেছ পেছু ঘুরেছে সারাক্ষণ, তার কাছে আমি নিজেকে খুঁজে দিইনি।'

'আমিই বলেছিলাম তুমি ছ-আনি গ্রামে ভিক্ষে করতে গেছ।'

'তাতে তোর কোনো অপরাধ হয়নি।'

'কিন্তু লোকটা তোমাকে সুন্দরী জানল কীভাবে?'

'তুই যেমন করে জানিস!'

'সে তো একদিন যখন তুমি সন্ধ্যা উজিয়ে ফিরলে, আমি তখন ঘাটে তোমার অপেক্ষায়, হিরে ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য। সেদিন অন্ধকার রাত ছিল, আমি এক মুঠো জোনাকি নিয়ে সেদিন সেই আলোয় তোমার মুখ দেখেছিলাম!'

'লোকটাও তেমনভাবে দেখেছে।'

'কীভাবে?'

'সে অন্য দৃশ্য। আমি ওর ঠোঁটে ঠোঁট রেখেছিলাম, তার একটা আলো ছিল।'

এরপর রাখাল বালকের সঙ্গে মুখোমুখি কিছুটা সময় নীরবতায় কাটল। রিজি আঁচলের গিঁট থেকে হীরকখণ্ডটা মধু রাখালের হাতে দেয়। বালক একবার দেখে, তারপর গামছার খুঁটে বেঁধে নেয়।

রিজি বালক মধুকে জানায় আজ সে হারোপ গ্রামে ভিক্ষে করতে যাচ্ছে।

১২. একটা ঘোড়ার প্রয়োজন ছিল, আর পুরুষের।

সন্ধ্যা আগত প্রায়। পাখিরা সব পুব থেকে পশ্চিমে উড়ে আসছে; পশ্চিমের আশ্রয়ে ফিরছে। রিজিও ফিরছে ঘাটের দিকে। এই পথেই তার ফেরা। অন্য কোনো পথে যেমন সে যেতে পারে না, তেমন ফিরতে পারে না। পাখির খাদ্য সংগ্রহের মতো সে যেমন তুলনীয়, তেমনই পাখির সঙ্গেই সে যায়, ফেরেও। এখানে সেই আলোর দিকে যাওয়া ও ফিরে আসার রূপ থাকে তার যাত্রায়। যখন পশ্চিম আকাশে সূর্য অস্ত যায়, তার আলোর আভার দিকে সে হাঁটতে থাকে। পাখিদের অদ্ভুত প্রসন্ন ফিরে আসা। গাছে গাছে জমে কলকাকলি। কাজল রঙে অন্ধকার জমতে থাকে গাছের বাহুতে, ঝোপঝাড়ের অভ্যন্তরে। আলো তখনো থাকে পশ্চিমে।

কোনো এক গেরস্ত বাড়িতে দুপুরের আহার করেছিল সে। পান-সুপুরিও পেয়েছিল। ভিক্ষের ঝুলিও ভরেছে। প্রাপ্তিযোগে বহনের ক্ষমতা পায়, আনন্দিত থাকে। সেই হালকা ছায়ালোক পুব থেকে ক্রমশ যখন সে পশ্চিমের রাঙা আলোর দিকে হেঁটে হেঁটে চলে, পশ্চিমেও ছায়ার আভাস বুঝতে পারে। বুঝতে পারে রাত্রির স্নিগ্ধ নির্জনতার ঘ্রাণ। যার ভিতর সে থাকবে, কাটাবে সারারাত।

এই যাত্রায় সে কোনো পথশ্রম ভোগ করে না। যেন কোনো প্রবজ্যায় থাকে। পৃথিবীর আহ্নিকগতির ভিতর নিজেকে রাখে। এই ফকিরি সে ভালোবাসে। এই ভিক্ষাবৃত্তি সে একদিকে গোপন রাখে, অন্য দিকে প্রকাশ করে। তার কোনো ঘোড়া নেই, পুরুষকে সঙ্গীও করতে পারে না। অথচ জানে সে এই পুব থেকে পশ্চিম; পশ্চিম থেকে পুব আলোর পেছনে ছুটে যাওয়ার জন্য একটা ঘোড়ার প্রয়োজন ছিল। আর ছিল পুরুষের। সে অভাব তো থাকতেই পারে। ফকিরের অভাব থাকে,

কিন্তু অভাববোধ থাকে না। কিন্তু সমাজের কাছে তার দেহের রূপ লুকিয়ে ফেলতেই চেয়েছে, তেমনি দেহাতীত রূপ প্রকাশ করতে চায়।

একজন পুরুষ তার রূপ দেখে তার প্রতি মুগ্ধ হয়েছে, এই কথায় সে আপ্লুত। কিন্তু তার হাতে ধরা দিতে চায় না। সে জানছে, সে ভিখিরি, ভিখিরি জেনেও সে যদি ভালোবাসে? কী করবে রিজি? ভেবে দেখেনি। সেই বড়লোক মানুষটা তার ভিক্ষাবৃত্তি মেনে নেবে? নিশ্চয় নয়। হায় সমাজ!

একজন কোটিপতি এক ভিখিরির প্রেমে পড়েছে, এই ঘটনাটুকু রিজির জীবনে কম আনন্দের নয়। এই গল্পটা সে পছন্দ করছে। আর রাতে বসে ভাবছে। আর স্বপ্ন দেখছে, স্বপ্ন দেখছে সেই পুরুষকে। তারই বিছানায় শুয়ে আছে সেই পুরুষ, আর সে সেবাযত্ন করছে।

সে তো পৃথিবীর আলোর সূচনা ও সমাপ্তি ধরে যাত্রায় থাকে, সে পুরুষের সঙ্গে দেখা হওয়া কঠিন, স্বপ্নেই থাকে। আর কোটিপতি ভিখারিনিকে প্রেম করছে, এই গল্পটা থাকে, থেকেই যায়। তেমন গল্পের খুব প্রয়োজন বুঝি বা, তাতে প্রেম তো থাকে!

কাজলের মতো ছায়া-অবয়ব নিয়ে ঘাটের অন্য পাড়ে দাঁড়িয়েছিল বালক। বলল, 'তাড়াতাড়ি ফিরে যাও, সেই লোকটা তোমার পিছু পিছু আসছে।'

রিজি বলল, 'আমার ভিক্ষের সময় সারাক্ষণ সে আমার পিছু পিছু ছিল। আমি নিজেকে খুঁজে দিইনি তাকে।'

হীরকখণ্ডটা ফিরিয়ে দেয় বালক।

আঁচলের খুঁটে হীরকখণ্ডটা বাঁধছিল যখন তখন সাজু মাঝি ধমকায়, 'কি হল, দেরি করছিস যে? তোর জন্যে আমার কি সময় বয়ে যাবে নাকি? আঁচলে কি এমন মহামূল্য জিনিস বাঁধছিস শুনি!'

'হিরে গো, হিরে।'

'মারব লগির ঘা, যত সব ফাজলামি!'

নৌকোয় উঠে পড়ে রিজি। বলে ওঠে, 'তুমি চাও আমাকে মারতে? মারো।'

'অন্ধকার হলে তোর চোপরা বাড়ে, আমি দেখেছি। যদি দেখতে তেমন হতিস!'

'ইস্ ভালোবেসে কথা বলতে কী খরচ হয় নাকি। মাগনা কথা বলবে, একটু ভালো করে বলতে পার না?'

'তোর জন্যে এতক্ষণ বসেছিলাম, তুই জানিস না?'

'চলে যেতে হয়, আমি সাঁতরে যেতাম।'

'কবে সাঁতরে গেছিস শুনি?'

'যেদিন সাঁতরে যাব, সেদিন গলায় কলসি বেঁধে নেব।'

'কলসি তো মাগনা পাস কুমোরদাদার কাছ থেকে।'

রিজি আর কোনো কথা বলল না।

তারা নীরব থাকল কিছুক্ষণ।

দুজনেরই অভিমান হয়েছে হয়তো বা।

ঘাটে আসতে সাজু মাঝি রোষবশে দিল ঠেলে রিজিকে। রিজি কিছুটা কাদায় পড়ল। 'আহ্' শব্দ করে উঠল। সাজুর এমন ব্যবহার আশা করেনি। মন আহত হল তাতে। একটু কাদার দলা হাতে তুলে নিল। আর পাড়ে উঠে পড়ে সাজুর গায়ে ছুঁড়ে মারল সেই কাদার দলা।

আর পেছন ফিরে রিজি ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে লাগল। যাতে সাজু পেছু পেছু ছুটে এসে লগি পেটা না করতে পারে।

কুমোর বাড়ির কাছ দিয়ে ছুটতে গিয়ে কুমারদাদার ডাক শুনল, 'এই রিজি!'

রিজিকে ছুটতে দেখে বৃদ্ধ কুমোরদাদাও পেছু পেছু ছুটতে লাগল।

অনেকটা দৌড়ে এসে যখন রিজি বুঝতে পেরেছ, মাঝির নাগালের বাইরে চলে এসেছে, তখন থেমে গেল।

পেছু পেছু এসে কুমোরদাদা তার কাছে থামল। 'ডাকছি, শুনতে পেলি না, ছোটালি তো বুড়ো মানুষটাকে।'

'কেন? ডাকছিলে কেন?'

'এই আমড়া কটা নিয়ে যা।'

হাসিমুখে আমড়ার পুঁটুলিটা নেয় রিজি। কিন্তু কুমোর দাদা তার চোখ দেখতে পায় না। কেন না অন্ধকার। দেখতে পেলে দেখতে পেত চোখে কিছু ভাষা।

কুমোরদাদা ফিরে যাচ্ছিল।

রিজি ডাকল, 'কুমোরদাদা!'

কুমোরদাদা থেমে যায়, 'হ্যাঁ, কি বলছিস।'

'কাল যখন আমি ওপারে থাকব, কুমোরদাদা, তুমি একটা কানাভাঙা কলসি আমার দিকে ভাসিয়ে দেবে?'

'কেন কী করবি?'

'ডুবে মরব।'

কুমোরদাদা কোনো কথা বলল না। ততক্ষণে গাঢ় অন্ধকার নেমেছে। আজ অনেক রাতে জ্যোৎস্না নামবে।

১৩. আপনি সারাদিন কোথায় পালিয়ে বেড়িয়েছিলেন?

খেয়াঘাটে পৌঁছে মোবাইলের টাওয়ার পায়নি সাহিল, এমনকি ছ-আনি গ্রামে গিয়েও। মোবাইল কোম্পানির নেটওয়ার্কের দৈন্য বুঝেছে। শুধু নিশারের সঙ্গে এক-দুবার কথা বলতে চেয়েছিল। ইচ্ছে ছিল বউ ফাহমিদাকে বলতে, আজ দুপুরে ফিরবে না, অন্য এক জায়গায় আছে। যেখানে আছে, সেখানে কারবারের কোনো সম্পর্ক নেই। এখানে অন্য প্রকৃতি, অন্য মানুষজনের ভিতর সে আছে। নিশার আর ফাহমিদা

যা বুঝে নেওয়ার বুঝে নিত, তাদের বোঝানোর কোনো দায় নিত না। যেহেতু মোবাইলের কোনো নেটওয়ার্ক পায়নি, সেহেতু সে ছিল একা। তাকেও নিশ্চয় ধরার চেষ্টা করেছে এরা। নেটওয়ার্কের অভাবের জন্য পায়নি।

শহর থেকে এত কাছে অথচ গ্রামগুলো, তবুও নো নেটওয়ার্ক? ব্যাপারটা তাকে খুব ভাবিয়েছে। মানুষের ভেদ রেখাও বুঝেছে। দেখেছে, লগি ঠেলে নৌকো পারাপার করার ঘটনা। দেখেছে কুমোর হাঁড়ি কলসি গড়ছে, শুনেছে কীট-পতঙ্গদের শব্দ, পাখ-পাখালির কলকাকলি। আর বালকের সারাদিন গরু চরাবার দৃশ্য দেখেছে। এদের কাউকেই এখনো মোবাইলের নেটওয়ার্কের আওতায় আনা যায়নি। সে নিয়ে তার অসন্তোষ হয়েছে। কিন্তু যা সত্য তা মেনে নিতে দোষ কী?

আজও পেছু পেছু গিয়েও সুন্দরীর সঙ্গে দেখা তার হয়নি। অথচ ওই পথে গিয়েছিল সে। কুমোর বলেছে, মাঝি বলেছে, রাখাল বলেছে। দেখা না হলেও এই যাত্রা তার ভালো লেগেছে, পণ্ডশ্রম মনে হয়নি। মনের ভিতরে প্রচুর স্নিগ্ধতা এসেছে।

দেখা হলে কী কথা হবে সুন্দরীর সঙ্গে, সেই বাস্তবতার পক্ষে বিপক্ষে কিছু দুশ্চিন্তা থাকত, দেখা হয়নি বলে তেমন কিছু হয়নি। একটা স্নিগ্ধতার আরাম নিয়ে ঘুরে বেড়িয়ে এসেছে।

রাতে সেই সুন্দরীর খোঁজে আসুরা বুড়ির বাড়ি গিয়ে একবার ব্যর্থ হয়েছিল, বার বার যে ব্যর্থ হবে না, তার কোনো নিশ্চয়তা নেই। হয়তো রাতে অন্য কোনো কোনো ঘরে ডেরা নেয়, যা জানে না সে। যেদিন রাতে সে তাকে চুমু খেয়েছিল, সে রাতে হয়তো আসুরার ঘরে আশ্রয় নিয়েছিল। সে ভিক্ষে করে বেড়ায়, আশ্রয়-ভিক্ষা করে থাকে হয়তো। কিছু জানে না, কিছুই জানে না।

ওখানে বালক মাঝি কুমোর কেউই মিথ্যে বলতে শেখেনি, তবে আশ্চর্য হতে হয় সেই ভিখারিনিকে বালক বলে সুন্দরী, আর কুমোর মাঝি বলে কুৎসিত—এটা হয় এক এক মনের কাছে এক একরকম অনুভবের সত্য থাকে বলে। ব্যক্তিভেদে সত্যের রূপ বদলে যাচ্ছে, এই জ্ঞান লাভ করেছে সাহিল। ব্যক্তি আসলে হাত পা মাথা বুক হাড় মাংস রক্ত মজ্জা নয়, আরও অন্য কিছু। যাকে বিজ্ঞান দিয়েও মাপা যায় না। সেখানে অনুভূতির অলৌকিকতাও বাস্তব। অথচ বাস্তবতার বিপরীতে অলৌকিকতা বলে থাকি।

গ্রামের দোকানে মুড়ি বাতাসা খেয়ে নিল। এই অভিজ্ঞতা তার ভালো লেগেছিল। রাস্তার টিউবওয়েলের জল খেয়েছে। পথে পথে ঘুরে ঘুরে পথের আরাম পেয়েছে। ঘাট পেরোবার আগে সেই বালক রাখালের সঙ্গে দেখা। সে বলল, সুন্দরী ফিরে গেছে, একটু আগে। সাজু মাঝি ক্ষিপ্ত হয়ে আছে, তার মুখে কপালে কাদা। ভিখারিনি কাদা ছুঁড়ে মেরে গেছে। কুমোর বলল, তাকে আর কানাভাঙা কলসি দেওয়া যাবে না। কুমোরের কেন এত অসন্তোষ ভিখারিনির প্রতি? কানা ভাঙা কলসি তো বিকোয়

না, সে তো ফেলে দিতে হয়, এক ভিখারিনি নিলে কাজে লাগে, তাও কুমোর দেবে না? এত অবহেলা কেন সেই সুন্দরীর প্রতি কুমোরের? সে বুঝল সুন্দরীকে এত সব অবহেলা অপমান নিয়ে প্রতিদিন যাত্রা করতে হয়। এসব গল্পের মতো মনে হল সাহিলের। এসব নিষ্ঠুরতাকে গল্প মনে করতে লাগল। গল্পের নিষ্ঠুরতাও তো আরাম দেয়, সেই আরাম পেতে লাগল। কুমোর জ্যাঠা, মাজু মাঝি, মধু হালদারের মাঝখানে রিজি গল্পের একজন হয়ে উঠছে। সেখানে গল্পের খাতিরেই যেন রিজির প্রতি নিষ্ঠুরতা তৈরি হচ্ছে। আসলে গ্রামের পেছনের পথটাও গল্পের মতো। বাবলা গাছ, কীটপতঙ্গ, খেয়া, খেয়া মাঝি, কুমোর ও কুমোর বাড়ি, রাখাল বালক ও গোরুর পাল এসব যেন গল্পের খাতিরে এসেছে। মোবাইলের নেটওয়ার্কহীন গ্রামের অংশও গল্পের জন্য।

সাহিল ফিরে যায় নিজের বাড়িতে, সুন্দরীকে খোঁজা সাঙ্গ করে নেয়। সেই ভিখারিনি দেশের ভিতরে আর একটা দেশে যেন যাত্রা করে। গল্পটাতে আকর্ষিত হয়ে উঠছে সাহিল আরও এ কারণে যে সেও এই গল্পের এক চরিত্র।

বউ ফাহমিদা এসে বলল, 'আমাকে কি আর তোমার পছন্দ হয় না?'

সাহিল বলল, 'আমার অপছন্দ কী, তুমি জেনেছ?'

'এসো আমরা এখন প্রেম করি বিয়ের প্রথম প্রথম দিনগুলোর মতো।'

'হাঁপিয়ে উঠবে।'

'কেন?'

'তুমি মোটা হয়ে গেছ।'

ফাহমিদা একটু ভেবে বলল, 'তোমার জন্য আমার খুব ভয় হয়।'

'আমার কি শৈশব দশা চলছে?'

'না, তা নয়, তবে'—

'তবে কী?'

'তুমি খুব ধনী হয়ে গেছ।'

'তাই তো আমি দরিদ্রের সঙ্গে ভাব করতে চাই। পারলে ভিখারিনির সঙ্গে প্রেম করব'।

'আমাকে কি আর তোমার পছন্দ নয়?'

'যাও আচারের বোয়েমগুলো তুলে আনো ছাদ থেকে, হিমে ভিজছে।'

মনে করাতে ফাহমিদা লাফিয়ে ওঠে। ভুলেই গিয়েছিল। ছুটল সে ছাদে।

জাসমিন চা করে এনেছে। তার শরীর হাসছে। চা দিল হাত বাড়িয়ে সাহিলকে।

সাহিল গরম চা হাতে পেয়ে খুশি হল। তারিফ করে বলল, 'বা, এখন চা খেতে ইচ্ছে করবে তুমি জানলে কী করে?'

জাসমিন হাসল। 'জানি।'

'কীভাবে?'

'আপনার কপালে স্বপ্নের ভাঁজ দেখেছি। ভোগের কিছু আনলে আপনি গ্রহণ না করে পারবেন না। এই তো গোটা আমি আছি সামনে, অস্বীকার করেঁন, গ্রহণের সাধ জাগছে না? জাগছেই।'

'দাঁড়াও চায়ে চুমুক দিই। বেশ ভালো চা হয়েছে।'

'গ্রহণের পর এমন তারিফ বাজবে আপনার বুকের ভিতর।'

'আমাকে দুর্বল কোরো না, প্লিজ!'

'আপনার চাওয়া আছে, কিন্তু আপনি ভোগী নন।'

'বেশ আমি কিছু না, কিচ্ছু না।'

'তা হলে তো চলবে না!'

'আমার স্ত্রী আমার জন্য খুব সুন্দর আচার বানায়।'

'আপনি আজ সারাদিন কোথায় পালিয়ে বেড়িয়েছিলেন, সারা দুপুর আমি বিছানায় শুয়ে ঘুমের ভান করে অস্থির হয়েছি?'

'কেন এমন করো, তাহলে আমি আবার অচৈতন্যদশায় ফিরে যাব।'

ভয় পেল জাসমিন। ফিরে গেল অন্য ঘরে। আপাতত রণে ভঙ্গ দিল।

সাহিল ভাবতে লাগল সেই রমণীর কথা।

১৪. বেরিয়ে যান আমার ঘর থেকে, ছিঃ!

বারান্দার চেয়ারে এসে বসেছিল সাহিল অন্ধকার রাতের গায়ে। বাড়ির সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে। তার এখনই ঘুম আসছিল না। জেগে বসে থাকে, ভেবে ভেবে থেকে, নিজের সঙ্গে কথা বলতে বলতে থাকতে ভালো লাগছিল। ভালো লাগছিল সেই যাত্রাটার কথা ভাবতে, যাত্রা অনুভূতিকে জাগরূক রাখতে। ঘুম এলে ঘুমতে যাবে, এখন এভাবে থাকাকে প্রাণ মনে করল। রাতের গা-ছুঁয়ে বসার একটা সুখকর অনুভূতি আছে, তেমনই সন্ধান পেল সে। এমনি করে বসে থাকলেই তো রাত বাড়ে, রাত গাঢ় হয়। বসে বসে বসাও ফুরিয়ে যায়, রাতও ফুরিয়ে যায়। আবার রাতের অপেক্ষায় থেকে যেতে হয়। সে রাত অন্য কোনো রাত।

এমন সময় চাঁদ নেমে এল আকাশে। অনেক রাতে চাঁদ উঠেছিল। আর চারপাশ চাঁদের আলোয় ভরে উঠল। রাত যেন আরও বেশি মুখর হয়ে উঠল। এই রাতের মধ্যে বসে বসে শুধু বসে থাকা। শুধু বসে থাকা? না, শুধু বসে থাকা নয়। সন্ধ্যায় অনেক বৃষ্টির পর অনেক রাতে যখন আকাশ ধুয়ে মুছে সাফ হয়ে যায়, তখন আর বৃষ্টির লেশ থাকে না আকাশের ভিতর, তেমনই আজকের যাত্রার স্মৃতি দূর হয়ে ওঠে, এত রাতে। মনে হয় যেন কোনো স্বপ্ন ছিল। সে-সবের মধ্যে থাকার যেন ক্লান্তি এসেছে। এখন একটু ব্যক্তিগতের টানাপোড়েন জেগে ওঠে। ফাহমিদার পাশ থেকে উঠে এসেছে। ফাহমিদার পাশ থেকে উঠে এলেও ফাহমিদা বুঝতে পারে নি। তার অনুপস্থিতির অভাববোধ ফাহমিদার নেই। কোথায় যেন সম্পর্কের

এক দাসত্বে বাঁচে। এই কথা, এই দ্বন্দ্ব নিয়ে এখন তার থাকা জোটে। এই কথা এই ভাবনারও ক্লান্তি আসে এক সময়। তখন তার হাই ওঠে। ঘুম পায়।

টেবিলে রাখা এক গ্লাস জল খেয়ে নেয়। ঘরে আবছা আলো। বাইরের জ্যোৎস্নার আভাও ঘরের আলোতে মিশেছে। দরজা খুলে রেখেছে, যাতে ঘরের সঙ্গে বারান্দার যোগ থাকে। তাতে ঘরটা আরও প্রশস্ত হয়। আরও স্থান এসে জোটে বসবাসের ঘরে। খোলা জানলার গায়ে আকাশও এসেছে।

সব মিলিয়ে একটা মনোরম পরিবেশ। কিন্তু ফাহমিদার পাশে শুয়ে শুনতে পেল ফাহমিদার নাক ডাকছে ভীষণ। তাহলেও প্রতিদিনের অভ্যাস, শুয়ে পড়লে কিছুক্ষণ পরেই ঘুমিয়ে যাবে। ঘুমিয়ে তো যায়ই।

বেশ ঘুম আসছে। ঘুমিয়ে যাচ্ছে সে।

এক সময় অনেক পরে অতি গভীর রাতে ঘুম হালকা হয়ে এল। যেন সে এক-দু বছর বিয়ের প্রথম দিকে আছে মনে হল। এই দেড় দু-বছর ফাহমিদার সঙ্গে তার বিয়ে হয়েছে। যৌবন উঁকি দিয়ে উঠেছে আচ্ছন্ন চৈতন্যে। সে তেমনটাই রাখতে পারল নিজেকে। তার মনে হল রাতে ফাহমিদার কাছে ঘুমোতে যাওয়ার আগে মায়ের বিছানায় মায়ের পাশে শুয়ে একটু আগে মায়ের সঙ্গে গল্প করেছে। তারপর কখন মায়ের বিছানায় ঘুমিয়ে পড়েছিল। এখন ঘুমের আচ্ছন্নতায় বোঝে, মাও ঘুমোচ্ছে। আর মায়ের সেই অতি পরিচিত নাক ডাকা শুনতে পায়। তার মনে হল, এতক্ষণ মায়ের বিছানায় ঘুমিয়ে পড়ায়, পাশের ঘরে মাত্র এক দেড় বছর বিবাহিত বউ ফাহমিদার অভিমান হয়েছে। আর ফাহমিদা রাগ করে ঘুমিয়ে গেছে নিশ্চিত।

এখনই যেতে হবে ফাহমিদার কাছে। মা তো একা একাই শোয়। সেই মায়ের চেনা নাক ডাকা, যে মা বছর দুই আগে মারা গিয়েছে। এখন সে শুয়েছিল মায়ের বিছানায়, তার যুবতী বউ পাশের ঘরে। বিয়ের প্রথম এক দু-বছর এরকম মায়ের বিছানায় শুয়ে ঘুমিয়ে পড়লে, বউদের অভিমানের চেয়ে রাগ হয় প্রচুর। তার জন্য ভালোবাসতে হবে প্রচুর।

আধঘুমে মায়ের বিছানা ছাড়ে সে। নীচে নেমে পাশ দিয়ে মাকে একবার দেখে। এই মৃত মাকে বছর দুই পরে দেখছে। সেই শোওয়ার ভঙ্গি, সেই নাক ডাকা! ফাহমিদার কাছে যেতে হবে তাকে। দরজা খোলাই ছিল। পাশের ঘরের দরজাও শুধু ভেজানো, কোনো অর্গল নেই। ঠেলা দিতেই খুলে যায়। টিকটিকি ডেকে ওঠে বুঝি। ছোটো আলোর ভিতর বিছানায় যুবতী ফাহমিদা শুয়ে আছে চিৎ হয়ে। ঘুমিয়ে পড়েছে কি? নাকি এখনও রাগ, অভিমান? রাগ অভিমান ভাঙাবার সময় নেই তার। বরং সরাসরি আদর দিয়ে রাগ অভিমান ভাঙাবে।

প্রথমে কপালে হাত রাখে। চোখের নিমীলিত পাতায় আঙুলের ডগা রাখে। খুলে যায় চোখের পাতা। বিছানার বাইরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই এই আদর জানায়।

তারপর হাতের মধ্যে হাত রাখে। আঙুলের ফাঁকে নিজের আঙুল রেখে সাড়া জাগায়, ফাহমিদাও সাড়া দেয়।

পোশাকের ওপর থেকেই বুকে মুখ রাখে। ফাহমিদা বাঁ হাত দিয়ে মাথার চুল তার মুঠো করে ধরে প্রতি-আদর জানায়। সে অভ্যস্ততায় ফাহমিদার বুক নগ্ন করে। ফাহমিদা তাকে হাত দিয়ে ঠেলে দেয়। তারপর হাত বাড়িয়ে দিয়ে হাতে হাত রেখে টানে নিজের দিকে, বিছানায় উঠে আসতে আহ্বান জানায়। ফাহমিদার হাতের টানে বিছানায় উঠে পড়ে আর বুকের ওপর বুক নিয়ে চেপে ধরে। তারপর ফাহমিদার বুক মুখে দেয়। কণ্ঠায় চুম্বন করে, গলায় চুম্বন করে, চিবুকে, ঠোঁটে। ফাহমিদাও সাড়া দেয়। মাথায় পিঠে হাত দিয়ে আদর করে। তারপর ফাহমিদাকে অভ্যস্ত আদরের ধরতাই খুঁজে নিতে কণ্ঠ থেকে নানা শব্দ বের করতে করতে নাম ধরে ডেকে ওঠার জন্য অপেক্ষা করতে লাগল নিজের ভেতর। আরও একটু চুম্বন আরও একটু মৈথুনের মাত্রা বেড়ে উঠতেই বলে উঠল আবেগে ভালোবাসায়, 'ফাহমিদা, ফাহমিদা, ফাহমিদা, ফাহমিদা!'

হঠাৎ অদ্ভুত আচরণ করল ফাহমিদা। বুক থেকে তার মাথাটা হাত দিয়ে ঠেলে সরিয়ে দিল। তারপর গোটা শরীরটাকে ঠেলে সরিয়ে দিল, বিছানার এক পাশে সাহিলকে সরিয়ে দিয়েছে। এ কীরকম আচরণ ফাহমিদার। আশ্চর্য হল সাহিল।

ফাহমিদা নীচে নেমে পড়েছে। তারপর ঘরের বড় আলোটা জ্বেলে দেয়। সাহিল দেখে ফাহমিদা জাসমিন হয়ে গেছে। ঘোর কেটে যায় মুহূর্তে সাহিলের। নীচে নেমে আসে।

জাসমিন নগ্ন বুকে আলোমাখা শরীর নিয়ে সামনে বাধা দিয়ে দাঁড়ায়। কটমট করে তাকিয়ে আছে। সাপিনীর মতো নিশ্বাস ফেলছে।

সাহিল হাত জোড় করল, 'আমি ফাহমিদার কাছে এসেছি মনে করে—'

'ছিঃ! থুতু ছেটাল জাসমিন। আমার কাছে এসে আমার নাম ধরে ডাকার সাহস নেই কেন আপনার?'

'আমি তোমার কাছে আসতে চাইনি।'

সামনে এসে সাহিলের বাঁ গালে একটা চড় মারে জাসমিন। 'বেরিয়ে যান আমার ঘর থেকে, ছিঃ!'

আর জাসমিন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দুই করতলে মুখ রেখে কাঁদছিল যখন, তখন সে তার ঘর থেকে চোরের মতো বেরিয়ে আসে।

চড় খাওয়ার পরও নিজেকে প্রশ্ন করল সাহিল, এতে কে অপমানিত হয়েছে? নিজেই উত্তর তৈরি করল, সে নয়, মেয়েলোকটি।

১৫. এই পরিস্থিতি ভয়ংকর যৌন উত্তেজক।

আজও বাগনানে তার ব্যাবসাক্ষেত্রে যায়নি সাহিল। অসুস্থতার জেরে এমনটাই

ঘটছে। নিশারের সঙ্গে ফোনে পরামর্শ হয় যদিও। ব্যাবসা তো নিশারই সামলায়। সেই অচৈতন্য ঘটনার পর থেকে ব্যাবসাক্ষেত্রে একদিনও যায়নি, পাঁচদিন বিগত হয়েছে। কদিন তো সুন্দরীর খোঁজে অভিযানে বেরিয়েছিল। আজ শুক্রবার, জুম্মাবার, আজ আর কোথাও বেরোতে চাইল না সাহিল। আর গতরাতে শালির সঙ্গে অমন কেলো হওয়ার পর কোথাও কোনো কিছুতে বেরোনোর প্রবৃত্তি কি থাকে? একটা আত্মগ্লানি থাকে। বিবেকের দংশন হয়।

রাতে জাসমিনকে আদর করার পর, অপমান মোছানোর দায় যেন তার থাকে, এমন একটা স্বতঃপ্রণোদিত উদ্যোগে ভরে ওঠে সে।

জাসমিন চা দিয়ে যায়, নাস্তা দিয়ে যায়. গায়ে পড়ে ঘনিষ্ঠ ব্যবহার দেওয়ার যে তার স্বভাব সকাল থেকে নিরুদ্দিষ্ট হয়েছে। মুখ গুঁজে, মুখ ভার করে, একটা কথা না বলে থাকে। অথচ প্রতিদিন যে-যে সেবায় থেকেছে, তাই তাই করে যায়। চা দিয়ে যায়, নাস্তা দিয়ে যায়, আবার চা দেয়। একটু সুপুরি কুচি দিতেও ভুল করে না। ফাহমিদাই তার কাছে জাসমিনকে পাঠায়। এতে এক ধরনের রাজনীতি আছে ফাহমিদার। যেন ফাহমিদা সঙ্গ দিতে দিতে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে, তার কাজটা করে দেয় জাসমিন। এমন ক্লান্তি ফাহমিদার বছর দুই ধরে ঘটছে। বছর দুই-ই বেশি মোটা হয়েছে। এই সঙ্গ-সুধায় সাহিল যাতে শান্ত শমিত হয়ে থাকে।

শান্তই তো, শমিতই তো সে। শুধু ঘুমন্ত জাসমিনের ঠোঁটে চুমু খাওয়ার অপরাধ ছাড়া সজ্ঞানে আর কোনো অপরাধ করেনি। জাসমিন ঘুমিয়ে থাকলে, অচৈতন্য থাকলে, এই চুম্বন পাথরকে দেওয়ার সগোত্র ছিল। কিন্তু ঘুমের ভান করে থাকার মধ্যে জাসমিনের ফাঁদ ছিল, এখন বুঝেছে সাহিল। সে কেন এমন ভুল করল? এমন অপরাধ করল? হোক না নারীটি ঘুমিয়ে আছে, তা সত্ত্বেও তাকে চুমু খেতে গেল কেন?

সেই চুম্বনের পর থেকে নিজের কোর্টে বল নিয়ে নিয়েছে জাসমিন। বেড়ে এসেছে, বেড়ে আসার সুযোগ পেয়েছে তার দিকে।

জাসমিন বুঝে নিয়েছে, যে নারী পুরুষের শরীরে আগুন জ্বালায়, সেই নারীর গুণাগুণ এখন অবলুপ্ত হয়েছে দিদির শরীরে। আর লোকটার খিদে থেকে যাচ্ছে। এত টাকা পয়সাওয়ালা মানুষ এই অভাব কাঁহাতক রেয়াত করে? দিদির কী হবে? দিদির পাশে দাঁড়ানো যাক। সে তো যুবতী, তার প্রতি মানুষটা আকর্ষিত হয় কতখানি? ঘরের দরজা খুলে রেখে, ঘুমের ভান করে পড়ে থেকে নিজের চাহিদা বুঝেছে জাসমিন সাহিলের সচেতন অসচেতন ব্যবহারের ভিতর।

আসলে ফাহমিদাও চাইছে জাসমিনকে বিয়ে করে শান্তিকল্যাণ করতে। জাসমিনও এগিয়ে এসেছে, এগিয়ে যেতে দেয় ফাহমিদা। ছোটোবোনকে লোকটার খিদমতে রেখে সংসার সর্বনাশ থেকে বাঁচাবে। এখানে একটা অবৈধ প্রেমের খেলা খেলছিল জাসমিন, এবং তাতে তাকে রাখতে চেয়েছে। শরীর চাওয়ার ভিতর সাড়া দিয়েছে। কিন্তু

ফাহমিদা মনে করে জাসমিনকে আদর করার অনস্তিত্ব বেদনা নিতে পারেনি জাসমিন। চড় মেরেছে, ঘর থেকে বের করে দিয়েছে। তারও আলাদা নাম, সেও আলাদা নারী, এই ব্যক্তিক হয়ে ওঠে জাসমিন।

ফাহমিদা জাসমিনকে এগিয়ে দিচ্ছে, এটা সত্য না হলেও, জাসমিন এই ভাঙা বেড়ার সুযোগ নিতে এগিয়ে এসেছে। যে কোনো একটা সত্য হোক না, জাসমিন না ফাহমিদা-জাসমিন, জাসমিনে লোভ জাগিয়ে, জাসমিনকে এই ঘরে স্থায়ী করতে চায়। শেষমেষ জাসমিনের সঙ্গে তার বিয়েটা ঘটে, পরিস্থিতির ফলাফল সেদিকে উঁকি দিচ্ছে। কিন্তু সাহিল তো একাধিক বিয়ে করতে পারবে না, সে ফকিরপাড়ার বাসিন্দা। সে যে সেই সুন্দরীর সন্ধানে যায়, তাকে বিয়ে করবে এই পরিণতি পূর্বনির্দিষ্ট রাখতেই পারে না। সেখানে তো প্রেম, এখানে কোনো প্রেম নেই।

তবে কিছু চ্যুতি আছে, আছে কিছু অপমান। যে চ্যুতি ঘটিয়েছে সে, অপমান সৃষ্টি করেছে। সেই অপরাধবোধে প্রয়োজনে শাস্তিও নিতে চায় সে। জাসমিনের মধ্যে একটাই অভাব, সে বুদ্ধি দিয়ে মেশে, আন্তরিকতাকে প্রধান মনে করে না।

সেই খেলায় যায় সাহিল, জাসমিন তার সেবায় থাকে, যত্নে থাকে। কোথায় কী খুঁজছে, খুঁজে হাতের কাছে এগিয়ে দেবে জাসমিন। গত রাতে অপমানিত হওয়ার পরও জাসমিন এসব আগের মতোই করে যায়। খেলাটাকে গ্রহণ করে সাহিল। গোসল করে নেয় সাহিল বেশ অনেক আগে। কেন না আজ জুম্মাবার, মসদিজে নামাজ পড়তে যাবে। সপ্তাহে এই একটা দিন শুধু জুম্বার নামাজ পড়ে সে। প্রচুর দান খয়রাত করে। জাকাত দেয়। ধর্মে সমর্পণও আছে প্রচুর।

গোসল করার পর পাজামা পাঞ্জাবি গেঞ্জি রুমাল টুপি বাড়িয়ে দেয় জাসমিন। ভিজে গামছা পরে আয়নার সামনে চুলে চিরুনি দিতে দিতে বিরতি দিয়ে পাশ ফিরে একটু দেখে জাসমিনকে। সত্যিই একটা নারী শরীর, কামনা উদ্রেক করার মতো।

প্রথমে গেঞ্জি পরার জন্য জাসমিনের হাত থেকে গেঞ্জি নিতে গিয়ে একটিবার চোখ রাখল জাসমিনের চোখে। 'রাগ করেছ' আমার ওপর?'

'আপনি জুম্মার নামাজ পড়তে যাবেন, ওসব কথা বললে আপনার ওজু নষ্ট হবে। এখন ওসব কথা থাক।'

'তুমি তো চুপ করে আছ, কিছু তো একটা কথা বলতে হয়?'

'আপনি গেঞ্জিটা উলটো পরলেন।'

গা থেকে গেঞ্জিটা খুলে আবার পরতে থাকে। 'তোমার খুব রাগ না?'

'আমি জানি না, আমি বলব না।'

'এই যা, পাজামার দড়ি ছিঁড়ে গেল!'

জাসমিন তাতে হাসল না, কৌতুককর অভিব্যক্তি প্রকাশ করল না। তেমনই নৈর্ব্যক্তিক ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে থেকে এগিয়ে এল তার দিকে শুধু। ছেঁড়া দড়িটা পাজামার

ভেতর থেকে টেনে বের করে আনল। তারপর মাথা থেকে চুলের ক্লিপ টেনে বের করে এনে পাজামার দড়িতে আঁটল। আর কোমরে পাজামা হাত দিয়ে তোলা অবস্থায় জাসমিন তার পাজামাতে দড়ি পরাতে থাকে। এই পরিস্থিতি ভয়ংকর যৌন-উত্তেজক। জাসমিনের হাত দুটি খেলা করে সাহিলের কোমরে। এমন একটা যৌন-উত্তেজক পরিস্থিতির ভেতর জাসমিন নৈর্ব্যক্তিক ভঙ্গিতে পাজামায় দড়ি পরায়। দড়ি পরানোর পরও প্রসন্নতা প্রকাশ করে না। যেমনই নির্ভার ভঙ্গিতে ছিল, তেমনই থাকে। যেন তার বৈরাগ্য, বিষাদ।

সাহিল বলল, 'ভালো মনে থাকছ না কেন?'

'জুম্মা পড়ে আসুন।' তেমনই নৈর্ব্যক্তিক ভঙ্গি। এবার আতর ছড়িয়ে দেয় পাঞ্জাবিতে, পাজামার সামনের দিকটা আতর লাগাতে গিয়ে একটু বাঁকা হাসল।

সেই হাসি দেখে সাহিল ক্রুদ্ধ হয়ে বলে ফেলল, 'তোমাকে আমি খুন করে ফেলব!'

জাসমিন তেমনই নির্ভার গলায় বলল, 'আমাকে তো আপনি খুন করেই ফেলেছেন।'

'কী চাও তুমি?'

'আমার আত্মপরিচয় নিয়ে খেলা করেছেন।'

'এসব তুমি কী করছিলে? পাজামার দড়ি, পাজামার সামনে হাত রেখে? তারপর হাসলেও?'

'বেশ করেছি।'

'এত জোর তোমার?'

'সাহস দেখাবার আপনার দুঃসাহস আছে? আপনি তো ভীরু, কাপুরুষ! আপনাকে আমি ছাড়ছি না।'

একথা শুনে সাহিলের মুখের আলো নিভে যায়। খুব ভিজে গলায় বলল, 'কী করবে শুনি?'

'আপনার বিরুদ্ধে কিছু একটা করব।'

'কী করবে?'

'দিদিকে জানিয়েছি, আপনি আমার ঘরে গিয়ে কাল রাতে-আমার শরীর নিয়ে খেলেছেন।'

মুখ ফ্যাকাশে হয়ে যায় সাহিলের। 'একথা তুমি ফাহমিদাকে বলেছ? কী সাহস তোমার!'

'এখন আপনি যান, পরে কথা হবে।'

'কী বলল দিদি?'

'দিদির মনের উদারতা খুব। আপনার কষ্ট বোঝে।'

'কষ্ট?'

'হ্যাঁ, কষ্টেই আছেন আপনি।—যান জুম্মা নামাজে, অকথা কুকথা নিয়ে আলোচনা করলেন, ওজু নষ্ট হয়ে গিয়েছে। ওজু করে নেবেন।'

একটু ক্ষিপ্ত গলায় বলে ওঠে সাহিল, 'আমি শুনতে চাই তোমাকে দিদি কী বলেছে?'

জাসমিন আরও ক্ষিপ্ত হয়ে বলল, 'এখন বলতে পারব না। জুম্মার নামাজে যান।'

'আমি ভুল করেছি জাসমিন, আমাকে ক্ষমা করো।'

'সন্ধ্যায় ছাদে কথা হবে।'

'কিছু একটা সাহস যোগাও। মনে এখন শান্তি আসে।'

'এখন কিছু বলব না।'

'প্লিজ, জাসমিন!'

'না।'

জাসমিন ঘর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছিল। তাকে ধরার চেষ্টা করে। জাসমিন হাত দিয়ে ঠেলে সাহিলকে সরিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়।

১৬. তার একাধিক বিয়েতে নিষেধ আছে।

মনটা বড় খারাপ ছিল বলে ম্যানেজার নিশারকে ডাকল বাড়িতে। আর নিশার আসতে তার মোটরসাইকেলে ব্যাবসাক্ষেত্র বাগনানে চলে গেল। একটু কাজে, হিসেব নিকেসে কাটাতে মনটা একটু ভালো হল। বাড়ি ঘরদোর ছেড়ে অন্য কোথাও থাকলে আরও ভালো হত। তা তো হওয়ার উপায় নেই। রাত দশটায় বাড়ি ফিরল। তারপর আবার সেই মনখারাপ। কোথায় যেন কিছু হয়েছে তার। যেন ফাহমিদা-জাসমিনের ষড়যন্ত্রের শিকার হয়েছে। সম্পর্কের এই উত্তেজনা ভালো লাগছে না। মন চলে যাচ্ছে বার বার সেই ভিখারিনির দিকে। ভিখারিনির সঙ্গে সাক্ষাৎও ঘটছে না। দেখা হওয়া যে খুব জরুরি, তা নয়। এই যাত্রা ভালোবেসে ফেলছে, এই যাত্রায় যেতে সে ভালোবাসছে। ভিখারিনির প্রেমস্মৃতি তাকে প্রসন্ন রাখছে। সে তো ভিখারিনিকে পেতে চায় না, তার প্রেমের কথা নিয়ে থাকতে চায়। সে তো তাকে বিয়ে করতে পারবে না, কেন না সে ফকিরপাড়ার মানুষ, তার একাধিক বিয়েতে নিষেধ আছে। ফকিরপাড়ার দোয়া হারিয়ে যাবে। সেই ইতিহাস, এই পাড়ার কোনো এক ফকির বিদ্রোহের সৈনিক ছিল। তাতে যোগ দিয়েছিল পেশাদার ফকিররাও, ভিখারিনির পূর্বপুরুষ। যদি সেই ভিখারিনির সঙ্গে তার দেখা হয় তাহলে ইতিহাসের পুনর্মিলন হয়। শুধু সেই ভিখারিনি ভিখিরিই থেকে গেছে, আর সে হয়েছে কোটিপতি।

এই দেখা করার বাসনা ও কল্পনা কম আকর্ষক নয়। এখানে যেন কল্পকাহিনির গন্ধ আছে। ফকিরপাড়ার কোটিপতি মানুষটা ঘুরে বেড়াচ্ছে ভিখারিনির পেছু পেছু। দেখা হওয়ার সম্ভাবনা সত্ত্বেও তাদের দেখা হচ্ছে না। পৃথিবীর অন্ধকার বা আলোর

ছায়ার ভিতর লুকিয়ে যায়। হয়তো প্রতি রাতে ঘর বদলায়। ঘর বদলে বদলে থাকে। রাতে নির্দিষ্ট গৃহে গেলে তাকে পাওয়া যায় না তাই।

সাংসারিক এই ব্যথায় আক্রান্ত হয়েছে সাহিল। সে আশ্রয় করছে তার সেই বাস্তবযাত্রার মধ্যে কল্পকাহিনিকে। যার পেছু পেছু গিয়েও তাকে খুঁজে পাওয়া যায় না। কোথায় যেন আড়াল হয়ে যায়। এই পেছু পেছু একজন যে যাচ্ছে, এই কথা কি জানে সেই ভিখারিনি? জানলে কি তার শিহরণ জাগে? কীভাবে নেয় ব্যাপারটা?

খাওয়া-দাওয়ার পর জাসমিন প্রস্তাব দিল ছাদে যেতে। ফাহমিদা যেতে চাইল না। বলল, একটু শুয়ে নেবে, তার চোখে খুব ব্যথা? চোখে ব্যথা কেন? চোখকে অবহেলা করে মন দিয়ে সবকিছু দেখছিল বলে, চোখ নিষ্ক্রিয় হওয়ার ফলে এখন চোখে ব্যথা শুরু হয়েছে। এ যেন কল্পকাহিনির কথা, মনে করল সাহিল।

ছাদে অপেক্ষা করছে জাসমিন।

পান খেতে খেতে ছাদে যায় সাহিল। আকাশ তখন অন্ধকার।

সাহিল বলল জাসমিনকে, 'বল, কী কথা বলবে?'

'একটু সুস্থির হন আগে।'

'আমি অস্থির আছি, অস্থিরই থাকতে চাই।'

'এত ভয় পান আপনি?'

'আমার ভয় নিজেকে নিয়ে।'

'অন্ধকারে আপনার শরীরের গঠন তো বেশ খুলেছে, বেশ পৌরুষময় মনে হচ্ছে।'

'কী চাও তুমি?'

'আমি চাই আপনি আমাকে গ্রহণ করবেন।'

'কালকে রাতের ঘটনার কথা তোমার দিদিকে জানিয়েছ যে?'

'হ্যাঁ বলেছি। যা সত্য, তাই বলেছি।'

'দিদির প্রতিক্রিয়া?'

'দিদি এই সম্পর্কটাকে সহজভাবে মেনে নিয়েছে।'

'মেনে নিয়েছে?'

'হ্যাঁ। আপনি ভয় পাচ্ছেন কেন? আপনার মতো মানুষ আর একটা বিয়ে করতেই পারেন, অন্য কেউ এ সংসারে এলে দিদির কি হাল হবে ভেবেই দিদির সঙ্গে এ নিয়ে পরামর্শ করেছি, রাজিও করিয়েছি। বলেছি আপনি আমার প্রতি আসক্ত।'

'এটা ভুল! ছিঃ ছিঃ! আমি তোমাতে কিছুতেই আসক্ত নই।'

'কাল রাতে আমার শরীর ভোগ করতে যাননি?'

'সে তো অন্য বাস্তবতা, কল্পনার বাস্তবতা।'

'মিথ্যাচার আমি একদম পছন্দ করি না।'

'তাছাড়া আমি একের বেশি বিয়ে করতে পারি না।'

'এত টাকা পয়সার মানুষ, তাহলে খায়েস কী আপনার?'

'ফকিরপাড়ার মানুষ একাধিক বিয়ে করার অধিকার ত্যাগ করে আসছে।'

'আপনি ফকিরপাড়ায় থাকবেন কেন?'

'এটা ইতিহাসের দায়। আমাদের পাড়ার ফকির বীর সৈনিক ছিল। সে হেরে গিয়েও সামাজিক ব্যবহার শিখিয়ে গেছে। সে আমাদের সেই ইতিহাসকে স্মরণ করায়।'

'কি আজেবাজে কথা বলছেন।'

'আজেবাজে কথা? কী বলছ তুমি?'

'আমাকে গ্রহণ করুন, আমাকে এই মুহূর্তে চুমু খান।'

হিংস্র হয়ে ওঠে এবার সাহিল। ঠেলা মেরে জাসমিনকে সরিয়ে দেয়, ছাদে পড়ে যায় জাসমিন। জাসমিন ছাদে পড়ে থাকে আর নীচে নেমে আসে সাহিল। ঘরে এসে দেখে ফাহমিদা ঘর হালকা আলোয় রেখে শুয়ে আছে বিছানায়, দেখার অভ্যাসে মনে হয় জেগে আছে।

টেবিলে রাখা জল খায় সাহিল।

একটা গোঙানি। একটা কাতর কণ্ঠ জেগে উঠছে ক্রমশ। বোধহয় ফাহমিদার কিছু একটা কষ্ট হচ্ছে। শরীরের কিছু হল কি? না মনের? কাছে গিয়ে দেখল ফাহমিদা চিৎ হয়ে শুয়ে আছে, আর মুখ দিয়ে শব্দ তুলে কষ্ট সইছে। প্রথমে জিজ্ঞাসা করার সাহস পেল না সাহিল। তারপর শুধলো, 'কী হয়েছে তোমার'

ফাহমিদা কিছু বলল না। আবার গোঙাতে লাগল।

'আমাকে বলো, তোমার কী হয়েছে?'

'তুমি আমার একটা কথা রাখবে?' কান্না চোখে বলল।

সাহিল বলল, 'কী কথা?'

'আগে বলো কথাটা রাখবে?'

'না জানলে কী করে বলব রাখতে পারব কিনা?'

'না তোমাকে রাখতে হবে কথাটা।'

'শুনি না?'

'তুমি আর একটা বিয়ে করো। তোমাকে আমার কসম! তোমাকে আমি সুখ দিতে পারছি না।'

'এমনভাবে নিজেকে ছোটো কোরো না ফাহমিদা!'

'তুমি জাসমিনকে বিয়ে করো, আমি ব্যবস্থা করছি। দুই বোনে বেশ থাকা যাবে।'

'তোমাকে কি জাসমিন কিছু বলেছে?'

'কী বলবে, ও তো কিছু বলেনি। আমি বুঝতে পেরেছি সব।'

'আমার নীচতা নিয়ে প্রশ্ন তোলেনি জাসমিন?'

'না। আমি বেশ বুঝতে পেরেছি, তুমি ওর প্রতি আসক্ত।'

'ও সত্যি কাল রাতের ঘটনার কথা কিছু তোমাকে বলেনি।'

'না। তুমি ওকে বিয়ে করো লক্ষ্মীটি।'

'আমার আর একটা বিয়ে করার কথার উৎস কোথা থেকে পেলে?'

'এ তো পড়েই আছে। তুমি এত ধনী হয়েছ, আর আমি তোমাকে সুখ দিতে পারছি না। তুমি আর একটা বিয়ে করে আনতেই পার। জাসমিনকে মনে ধরেছে, এতে আমি দুশ্চিন্তা মুক্ত হয়েছি, কাকে না কাকে ধরে আনতে। তার আগেই আমি ব্যবস্থা করে দিতে চাই। আব্বুজির সঙ্গে আমিই কথা বলে রাজি করাব। অন্তত জাসমিন সংসারের মন্দ চাইবে না, দিদির প্রতি তার ভালোবাসাও আছে।'

সাহিল মাথা নাড়ল, 'না না আমি একটার বেশি বিয়ে করতে পারি না। আমি ফকিরপাড়ার মানুষ জানো না?'

'ওসব আর কেউ মানছে না, কেন নসুচাচা বিয়ে করেনি?'

'ফকিরের শর্ত আমি জানি।'

'তাহলে শর্ত ভাঙোনি তুমি বলছ? কাল রাতে অবৈধ যৌনাচারে লিপ্ত হওনি?'

'কে বলেছে? জাসমিন?'

'আমি মনের চোখে দেখেছি, আসল চোখে তাই কেঁদে কেঁদে ব্যথা!'

এই অবৈধ যৌনাচারের ঘটনার কথার সাহিলের আত্মপক্ষ সমর্থনের কোনো কথা নেই। শুধু এই কথা ভেবে আক্রোশে ফেটে পড়ে মনে মনে, জাসমিন নাকি তার দিদিকে সব বলেছে, আর তাকে গ্রহণ করার সম্মতি আদায় করে নিয়েছে। জাসমিন মিথ্যাচার করেছে তার সঙ্গে। তবে আশ্চর্য হয়, ফাহমিদাও একই কথা বলছে। দুজনের মধ্যে এ নিয়ে কথা হয়নি? এই সব ঘটনা, ঘটনার বিভ্রম, মিথ্যাচার হলেও সত্যের মিল আছে, এসবের ভিতর সাহিল ছটফট করে কাটাপোনার মতো। তার রক্তক্ষরণ হয়। সে একটার বেশি দুটো বিয়ে কোনোদিন করতে চাইবে না। এরা তাকে পাগল করে ছাড়বে নিশ্চিত।

১৭. এ ব্যাপারে তিনি খুবই খোলামেলা, স্পষ্ট ও লজ্জাহীন।

সে যে জাসমিনের সঙ্গে অবৈধ যৌনাচারে লিপ্ত হতে চায়নি, সে ছাড়া আর কে বুঝবে? সে বউয়ের সঙ্গেই শুতে চেয়েছিল। এবং শুতে শুতে এই বোধ ছিল যে বউ ফাহমিদার সঙ্গেই যৌনাচারে যাচ্ছে। এতে কোনো অবৈধতা নেই। শুধু ফাহমিদাকে তরুণী মনে করে নিয়েছিল। বিয়ের প্রথম প্রথম দু-এক বছরে যেমনটি ছিল ফাহমিদা, রাতে সেই ফাহমিদার কাছে গিয়েছিল। তার এই কল্পনার বাস্তবতা তার কাছে ঘোরতর সত্যি ছিল। এ কথা ফাহমিদাকে বুঝিয়ে বললেও ফাহমিদাকে বিশ্বাস করানো কঠিন হবে। ভয়ংকর রকম এক অসহায়তার মধ্যে পড়েছে সাহিল। জাসমিনের কাছেও প্রমাণ হয়ে গেছে, সে তাকে যৌনতায় পেতে চেয়েছে, কিন্তু জীবনে গ্রহণ করার বিরোধ তার আছে। এমন মানুষ নিজেকে প্রমাণ করতে চায়নি সাহিল।

আর এ ধরনের বিভ্রান্তিকর ঘটনা ঘটে যাওয়ায় যে পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে, তাতে জাসমিন মনে করছে, সাহিল এক নারীতে সুখ পাচ্ছে না, আরেক নারী তার চাই, আর সে নারী যদি সে হয়, তাহলে অন্য নারী আসার যে বিপদ তার থেকে বাঁচাতে পারবে দিদিকে, সেই নারীর প্রতিদ্বন্দ্বী যদি সে হয়ে ওঠে, বিকল্প যদি সে হয়ে ওঠে। তার জন্যে সে উদ্যোগ নিয়েছে, চালাকি করছে, প্রলোভিত করছে, ফাঁদ পাতছে, মিথ্যে বলছে। আর ফাহমিদা ভয়ংকর বিপদের আশঙ্কা থেকে মুক্ত হতে, কম বিপদকে আশ্রয় করতে, সেই নারীর জায়গায় জাসমিনকে মেনে নিতে বাধ্য হচ্ছে। এই পরিস্তিতির জন্য প্রস্তুত হয়ে পড়ছে। কল্পনার চোখে এখন সে অনেক কিছু দেখতে পায়, দেখতে দেখতে কষ্ট পায়। সে চাইছে সাহিল জাসমিনকে বিয়ে করুক অবিলম্বে। জাসমিনেব প্রতি সাহিলের আসক্তি জেনেছে, তাতে সে একভাবে বড় বিপদ থেকে রক্ষা পাবার কথা ভাবলেও কষ্টকর পরিস্থিতির মধ্যেও পড়েছে। ছোটো বোনকে সতীন ভেবে নেওয়ার, মেনে নেওয়ার বাধ্যতায়।

পৃথিবীর কোনো বউই চায় না, তার জায়গায় অন্য কেউ থাকুক। হোক না সে আদরের ছোটো বোন। ফাহমিদা পরিস্থিতির ওপর নজর রেখে এই আত্মঘাতী সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে। অথচ এ ব্যাপারে ছোটোবোনের সঙ্গে কোনো কথা হয়নি। সে যে কথা হতে পারত, এবং কথার ভিতর যে যে সিদ্ধান্ত হতে পারত, সেই সব অনিবার্যতার ইঙ্গিত খুঁজে নিয়ে এমন এক মিথ্যা ঘটনায় যায় জাসমিন, তাকে সত্য মনে হবে। কেন না জাসমিন বলে বড়বোনের সঙ্গে এ বিষয়ে কথা হয়েছে, সেই কথার ভিতর বড়বোন যে যে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে, সেই সেই সিদ্ধান্তের কথা জাসমিন যেমন বলে, ফাহমিদাও বলে।

এক ধরনের সত্য দেখতে পায় সাহিল। তার অসহায়তা কেউ বোঝে না। তার বিভ্রমকে সত্য মনে করে নিয়েছে এরা দুজন। রাতের বিছানায় সে মায়ের পাশে শুয়েছিল, আর মায়ের নাক ডাকছিল, এই অনুভূতির ভিতর তো সে ফাহমিদা পাশের ঘরে একা শুয়ে আছে মনে করে ফাহমিদা ভেবে জাসমিনের সঙ্গে যৌনতায় যেতে চেয়েছিল, অনেক দূর পর্যন্ত গিয়েছিলও। সেই যাওয়ার সে সত্য, তার কাছে নিজে থাকতে পারে, কিন্তু জাসমিন-ফাহমিদাকে নিয়ে যেতে পারে না। তারা যে বাস্তবতার ভিতর থেকে কথা বলছে, সেখানে নেই সাহিলের বাস্তবতা। সে তো খুঁজে বেড়ায় সেই ভিখারিনিকে, যাকে সে বিয়ে করতে চায় না, চায় তার প্রেম। যে প্রেম ফাহমিদা জাসমিনও দিতে পারত। ওরা প্রেমের অভাববোধের কথা বলছে না।

সকাল সকাল পাড়ার ফতে আলি ঠাকুরদার কাছে যায়। যাঁর এখন নব্বুইয়েরও বেশি বয়স হয়েছে। চামড়া ঝুলে গেছে, কোমর ভেঙে গেছে, চোখে দেখতে পান না। যেটুকু দেখেন অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়ে দেখেন। পাড়ার সবচেয়ে প্রবীণ মানুষ তিনি। ফকিরপাড়ার ঐতিহ্য তিনি ভালোবাসেন, আর সাহিলের মধ্যে সংক্রামিত সঞ্চারিত করেছেন।

ঘরের ভিতর বিছানায় বসেছিলেন ফতে আলি।

সাহিল ঘরে ঢুকে কাছে গিয়ে দাঁড়ায়।

ফতে আলির এক নাতনি পাশে দাঁড়িয়ে বলে, 'কে এসেছে দেখো' বলে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়। এই ব্যবহারে বোঝা যায় ফতে আলি তেমন গুরুত্ব পান না এখন আর এই বাড়িতে, এখনও ঝামেলা হয়ে বেঁচে আছেন। এই পৃথিবীতে তিনি বোঝা।

ফতে আলি ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে আছেন।

কাছে গিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে সাহিল।

'ও, ফকির পাড়ার বড়লোক ফকির!'

'চিনতে পেরেছেন দাদা!'

'আর একটা বিয়ে করছ নাকি?'

'একথা বলছেন যে'—

'নশুও বিয়ের আগে এসেছিল আমার কাছে। সেও মানতে চায়নি। তারপর তো বিয়ে করল। সবাই দেখল। আর তুমি এত টাকা পয়সা করেছ'—

'না না আমি ফকিরপাড়ার মানুষ। বড়লোক হলেও মনে মনে ফকিরই আছি।'

'এই তো, এই কথাই তো শুনতে চাই তোমার কাছ থেকে। যতদিন বাঁচবে, ফকিরপাড়ার মান রাখবে। আমি তো মরতে বসেছি, কিন্তু ভয় নিয়ে যাচ্ছি, ফকিরের ওয়াদা রাখছে না, ব্যতিক্রম ঘটছে, ফকিরপাড়ার মানুষদের ভিতর। দুশো বছর তো মানুষ রক্ষা করে এসেছে, এখনও তোমারা রক্ষা করে যাও। তোমরা ফকিরপাড়ার ফকির হলেও তোমরা দরিদ্র নও, তোমাদের ধনদৌলত হবে, ফকিরকে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলে তা মানো। মেনে চলাই হবে তোমার কর্তব্য।—তুমি বিয়ে করছ নাকি আর?'

'না না।'

'অনেক তো ধনী হয়েছ।'

'সবই আপনাদের দোয়ায়।—তা আপনি তো চোখে দেখতে পান না?'

'না।'

'তাহলে আপনি আমাকে চিনলেন কী করে?'

'আমি অভিজ্ঞতার দেখা খুঁজে চিনি।'

'এই বয়সে পৌঁছে এখন আপনার কী ইচ্ছা?'

'মরার। ভালোভাবে মরার ইচ্ছা।' অদ্ভুত হাসেন ফতে আলি। 'তোমার এখন ভোগের জীবন। ভোগটা খুব তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে যায় জানো, অবহেলা কোরো না। ফকিরপাড়া ছাড়ছ নাকি?'

'না না।'

'ভালো কথা। কিন্তু কিছু একটা তোমার ঘটেছে। এখন যদিও আমি মানুষের

সব রকম বাসনার কথা ভুলে গেছি।'

ফতে আলির মেজোছেলে রহমত হাসিমুখে দাঁড়িয়েছে ঘরের ভেতর। পাশ ফিরে সাহিল রহমতচাচাকে দেখে। রহমতচাচার বিনয়ের কারণ বোঝে। ফ্ল্যাট-বাড়ির নীচে রহমত একটা দোকানের জন্য সাহিলের কাছে দরবার করে থাকে প্রায়ই। ছেলেকে দোকান করে দেবে। সি. ডি সেন্টারের দোকান। সি.ডি. ডি.ভি.ডি. লাইব্রেরিও থাকবে সেই সঙ্গে।

সাহিল বলল, 'এখন কোনো কথা হবে না, অফিসে যাবেন।'

'একটু দেখছেন তো?'

'বললাম না।'

'একটু চা খাবেন তো?'

'না। একটু কথা বলেই চলে যাব, বেশিক্ষণ থাকব না।'

ফতে আলির সজ্ঞানতা আছে, বললেন, 'তোমার যতক্ষণ থাকতে ইচ্ছে করে থাকো না!'

'না না, এই তো বেশ কথা হল।'

'আরও থাকো, তবে আমার পেচ্ছাপ পেয়েছে।'

'ও হ্যাঁ।'

'এই খাটের তলায় পায়ের দিকে একটা পট আছে, সামনে তুলে দেবে?'

'ও হ্যাঁ হ্যাঁ।' মাথা নীচু করে পট খোঁজে সাহিল। পায়ও। পটটাতে অনেকটা পেচ্ছাপ ভরা আছে। কেউ ফেলে দিয়ে আসেনি। সাহিল ইতস্তত করে।

ফতে আলি বললেন, 'পেচ্ছাপটা ফেলেনি তো? ওটাই দাও, আমি জানি, উপচে পড়বে না। বারে বারে কম কম পেচ্ছাপ হয়।'

ফতে আলি বসে বসে পটে পেচ্ছাপ করেন। কোনো রাখঢাক নেই তাঁর। এ ব্যাপারে তিনি খুবই খোলামেলা, স্পষ্ট ও লজ্জাহীন।

১৮. তুমি কি মেয়েছেলেদের দালালি করছ?

বাগনানের অফিসে এসে আজ সাহিল ম্যানেজার নিশারের কিছু ভুল ধরিয়ে দিল। সে তো পাকা ব্যবসায়ী। সে ছোটোখাটো ভুলও সইতে পারে না। না হলে এত টাকার মালিক হতে পারত না। লরির টায়ারের ভাড়া দুদিন আগাম দিয়েছে কেন? টাটা সুমো পুলিশের কেস খেল কেন? পুলিশকে এক-দুশো টাকা গুঁজে দিলেই কেস এড়ানো যেত। ফ্ল্যাটের ঢালাইয়ের নির্ধারিত দিন পেরিয়ে গেছে, কন্ট্রাক্টরের সঙ্গে দৈনিক ক্ষতিপূরণের হিসেবটা করে রাখা হয়নি কেন? একদিনের চা খরচ আড়াইশো টাকা। নিশার বলল, থানার আই. সি.-র লোক এসেছিল আই. সি. একটা সাড়ে সাতশো রাম চেয়ে পাঠিয়েছিল, তাই আড়াইশো টাকা চায়ে হয়েছে। মদের কথা তো লেখা যায় না খাতায়?

কিন্তু দোকান বুকিং-এ রহমত আলি ঢুকল কী করে? সব বুকিং তো হয়ে গিয়েছিল? কার টাকা ফেরত দিলে তুমি? হরেন সাঁতরার হার্ট অ্যাটাক হয়েছে, পি. জি.-তে। হাতে-পায়ে ধরে টাকা নিয়ে গেছে। এভাবে টাকা ফেরত হয় না। পরে টাকা না দিতে পারলে বুকিং ক্যানসেল হয়ে যায়। তাছাড়া রহমত আলির বুকিং ন্যায্য নয়, কেন না নির্ধারিত সীমার চেয়ে কম টাকা দিয়েছে। পাড়ার লোক, আত্মীয় দেখতে গেলে ব্যাবসা চলে না। ওসব খাতির বাড়িতে। ব্যাবসা, ব্যাবসার জায়গায়। ব্যাবসার নিয়ম আছে, না হলে লালবাতি জ্বলবে ব্যাবসায়।

কড়া ভাষায় তিরস্কার করেছে সাহিল নিশারকে। বন্ধু লোক, ঝকাঝকার পর মনটা খারাপই হয়ে গেল সাহিলের। ঘোষণা করে দিল, আজ আর বাড়িতে খেতে যাবে না, এখানেই কিছু খেয়ে নেবে, রাতে একেবারে বাড়ি চলে যাবে।

দুপুরের পর মোবাইলে জাসমিনের এস. এম. এস. এল, 'দুপুরে খেতে এলেন না কেন?' উত্তর জানাল না সাহিল। অবহেলা করতেই ইচ্ছে করল।

কিছুক্ষণ পর ফাহমিদা তার মোবাইলে ফোন করল, 'খেতে এলে না যে?'

'গেলাম না।'

'কেন?'

'যেতে ইচ্ছে করল না, রাতে যাব।'

'শরীর ভালো আছে?'

'হ্যাঁ হ্যাঁ।'

'তোমার জন্য আমার খুব চিন্তা হয়।'

'দুপুরে একটু ঘুমিয়ে নিও।' ফোনটা সাহিলই কেটে দেয়।

গৌর হোটেল থেকে দুপুরের খাবার আনিয়েছিল। খেয়ে দেয়ে পান চিবোতে লাগল। বন্ধুত্ব করল নিশারের সঙ্গে, বকুনির পর বন্ধুত্বে গেল। বকুনিও দরকার, বন্ধুত্বও দরকার।

জাসমিন তার মোবাইল থেকে সাহিলের মোবাইলে ফোন করল। 'খেতে এলেন না যে!'

সাহিল না শুনতে পাওয়ার ভান করে বলল, 'শুনতে পাচ্ছি না, একটু জোরে বলো।' নিশ্চয় বিছানায় শুয়ে শুয়ে তাকে ফোন করছে।

জাসমিন একটু জোরেই বলল, 'আমার এস. এম. এস.-এর উত্তর দিলেন না যে?'

'শুনতে পাচ্ছি না,'

'আপনার আমার কথা মনে থাকে?'

'কিচ্ছু শুনতে পাচ্ছি না।'

'আমি তো আপনার কথা শুনতে পাচ্ছি।'

'আমি কিছু শুনতে পাচ্ছি না।'

'এই তো শুনতে পেলেন।'

'হ্যালো, হ্যালো।' না শুনতে পাওয়ার ভান করে। 'কী বলছ তুমি?'

'বলছি, আমার কথা আপনার মনে থাকে? মনে মনে আমার কথা ভাবেন?'

'হ্যালো, হ্যালো।'

'এবার শুনতে পাচ্ছেন?'

'না। হ্যালো—হ্যালো'—

ওপারে ফোনটা কেটে দিতে বাধ্য হয়। সাহিল নিজেকেই নিজে চোখ মারে।

বিকেলে নির্মীয়মাণ ফ্ল্যাট দেখতে যাবে। সেখানে আরও কত গাফিলতি আছে, কে জানে। নিশারের প্রতি ভরসা করা যায়, কিন্তু নিজেকেও নজর দিতে হয়। স্টেশন লাগোয়া দশকর্মা ভাণ্ডার দেখে আসবে। সব জায়গায় নিজের উপস্থিতিটা খুব জরুরি; এটা বোঝে সাহিল। না হলে সব রসাতলে যাবে। এসব সে তিল তিল করে গড়েছে। আবার জাসমিনের এস. এম. এস. 'AMAR KATHA KI MONE THAKE'। সাহিল মুছে দিল এস. এম. এস.-টা। ব্যাবসার প্রয়োজনে দু-একটা ফোন করতে ল্যান্ড লাইনের ফোনটা নিল। সবাই তার অনুপস্থিতির সুযোগ নেয়। টায়ার ভাড়া যে দেয়, সেই মালিককে ফোন করল। একটু ধমকাল। আবার বিনয় দেখালও। মজাকিও করল। ব্যাবসা করতে হলে কত কী জানতে হয়। কত কী অভিনয়ও করতে হয়।

ব্যাবসাক্ষেত্রে সে একরকম, বাড়িতে আর একরকম। এখানে এসে সে বদলে যায়। এই বদল তার পছন্দও।

তবুও মনে থাকে তার সেই ভিখারিনির কথা। যার পেছু পেছু সে যেতে ভালোবাসে। সেই সব দৃশ্য ও চরিত্রের মধ্যে যেতে সে আবার চায়ও।

নিশারের বন্ধুত্বে ফিরে এসেছে এবার। 'কি গো নিশার, বউ কি কম আদর করছে?'

নিশার হেসে ওঠে।

'আরে মুখ গোমড়া করে থাকলে চলবে, মনে ফুর্তি আনো!'

'মালিক একজন কমপিউটার জানা কমবয়সী মেয়ে আছে, অফিসে রাখব?'

'কি ব্যাপার নিশার, মেয়েছেলে কর্মচারী রাখবে?'

'খুব গরিব মেয়ে, শিক্ষিত, মুসলমান। তাছাড়া ব্যাবসার কাজ কম্পিউটারে না করলে পিছিয়ে পড়বেন মালিক। তাছাড়া মেয়েটা ভালো, আপনার জন্যই ভেবেছি। মনে ফুর্তি পাবেন।'

'ব্যবসায় মেয়েছেলের ফুর্তি রাখবে তুমি, ব্যবসায় যে লালবাতি জ্বলে যাবে!'

'তাহলে বাড়িতে নিয়ে যান। আপনার দুঃখ বুঝি।'

হেসে ফেলে সাহিল। 'আমি ফকিরপাড়ার মানুষ না?'

'তাতে কী হয়েছে?'

'আমি একটার বেশি বিয়ে করতে পারি না। নিষেধ আছে। তুমি আমার জন্য ভেবেছ এতেই আমি খুশি। কিছুদিন পর কম্পিউটার আনাব। তবে পুরুষ কর্মচারী রাখব। তুমি কি মেয়েছেলের দালালি করছ?'

'আপনার খুব কষ্ট মালিক।'

'সেই সুন্দরীর তো সন্ধান দিতে পারলে না।'

'আসলে সুন্দরী নেই ও বাড়িতে। পেলে কী করতেন?'

'কিছুই করতাম না। দেখা হত, শুধু কথা হত।'

'আর কিছু?'

'আর কিছু না।'

'যা নেই, তা নিয়ে থাকতে বুঝি ভালোবাসেন?'

সব কিছু আছে বুঝলে, দেখা হয় না। আমরা সবাই কিছু না কিছু ব্যাপারে অসহায়।'

'আপনি ফোনে ওপারের কথা শুনতে পেয়েও কথা শুনতে না পাওয়ার কথা বলছিলেন।'

'সব কথায় যেতে ভালো লাগে না।'

'ফোনে কে ছিল?'

'বলব না।' হাসতে থাকে সাহিল। মজা আনে চোখে মুখে। তারপর আরক্ত মুখ করে বলল, 'শালি!'

কিছু ভালো কথা শোনার জন্য নিশার উশখুশ করে উঠল।

সাহিল মুখ ফিরিয়ে অন্য দিকের কাজে মন দেয়। বুঝতে পারে রক্তক্ষরণ হয়ে চলেছে তার।

১৯. বড় মানুষটার ঠোঁটে লিপস্টিকের রঙ লাগিয়ে দিয়েছে ছুঁড়িটা।

অনেক রাত হয়েছে। রিজি তার সাজগোজ আরম্ভ করে দিল দেওয়ালে গাঁথা আরশির সামনে দাঁড়িয়ে। সারাদিনের দূর্ছাই আর অসুন্দরের অবহেলার গ্লানি মুছে ফেলতে লাগল, নিজেকে আরও সুন্দরী করে তোলার ভিতর।

আসুরা নানি কথা পাড়ল সেই বড় মানুষটার। খুব ঠকানো গিয়েছে লোকটাকে, তাই নিয়ে নিজেরা মজা করছিল নিজেদের মধ্যে। হাসাহাসি করছিল নিজেরা। লোকটা কি বোকা. তার বোকামিতে তারা খুব মজা করেছে।

রিজি বলল, 'আচ্ছা নানি, সত্যিই যদি আমি একটা বিয়ে করি?'

'কেন তোর তো এই ভিক্ষে করাই ধর্ম?'

'মাঝে মাঝে মনে হয় নিজেকে ঠকাচ্ছি। আমরাও তো রূপযৌবন আছে, আমারও তো সখ-আহ্লাদ আছে।'

'এই কথা মনে হয় নাকি তোর?'

'কেন, আমি কি রক্তমাংসের মানুষ নই?'

'বেশ বেশ নানিটাকে কে খাওয়াবে শুনি? আমি মরে গেলে ভাবিস।'

'তোমার জন্যই আমি ভিক্ষায় যাই না, নিজের জন্যও যাই।'

'তাহলে?'

'কেন ফকির বংশে জন্মালাম!'

'ইস্‌, কাঁদছিস নাকি লো মাগি?'

'না, অশ্রুপাত করছি।'

'কাজল ঘেঁটে যাবে।'

কিছুক্ষণ অশ্রুপাত করে আবার সাজতে লাগল।

আসুরা পানের বাটার সামনে বসে থাকে তেমনই।

অমনি দরজায় করাঘাত।

আসুরা চকিতে উঠে দাঁড়িয়ে রিজিকে আলোর ছায়ায় ঘরের কোণে নিয়ে যায়।

আবার দরজায় করাঘাত। 'দরজা খুলুন, একজন অসুস্থ হয়ে পড়েছেন রাস্তায়।'

দরজা খুলে ধরে আসুরা। বড়মানুষটার ম্যানেজার সামনে দাঁড়িয়ে আছে।

আসুরা প্রশ্ন করল, 'আজকেও সেই বড়মানুষটা অসুস্থ হয়েছে বুঝি?'

'হ্যাঁ আগের দিন একবার এখানে নিয়ে এসেছিলাম। আজও অসুস্থ হয়েছেন। রাস্তায় অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছেন। চলুন আমার সঙ্গে, ধরাধরি করে আনি। তারপর ডাক্তার ডেকে আনছি। আপনি ছাড়া আর কি কেউ থাকে এই ঘরে?'

'আর কে থাকবে? বুড়ো মারা গেছে বহুদিন। আর ভাতার ধরিনি।'

'কোনো সুন্দরী রমণী থাকে কি?'

'থাকত।'

'থাকত?'

'হ্যাঁ থাকত, যখন আমার বয়স কম ছিল, আমিই তখন ছিলাম সুন্দরী রমণী।' অট্টহাস্য করে ওঠে আসুরা।

তারপর দুজন ধরাধরি করে বড়মানুষটাকে বিছানায় শুইয়ে দেয়।

ঘরের ভিতর দাঁড়িয়েই নিশার ফোন করে ডাক্তার হাজরাকে। তারপর ফোন শেষ করে রাস্তায় বেরিয়ে যায়। মোটর সাইকেল চালিয়ে বেরিয়ে গেল।

আসুরা ঘরের কোণে গিয়ে রিজির সঙ্গে ফিস ফিস কথা বলে আর হাসাহাসি করে গায়ে গা লাগিয়ে।

তারপর বিছানার কাছে আসুরা ফিরে এসে দেখে সাহিলকে। আসুরার কেমন সন্দেহ হয় বড় মানুষটা অচৈতন্য হয়নি আজ। মুহূর্তে সাবধান হয়ে যায়, আর রিজিকে সাবধান করে দিয়ে যায়। রিজি ফিস ফিস করে বলল, 'তাহলে ঠোঁটে তিনটি চুমু খাওয়ার সাধ মেটাব কী করে?'

'দাঁড়াও আমি দেখছি। আমি সম্মোহন জানি।'

'হ্যাঁ তোমার তো অনেক বিদ্যে। প্লিজ নানি তুমি একে সম্মোহন করে অচৈতন্য করে দাও। আমি চুমু না খেয়ে থাকতে পারব না। এমন সুযোগ আর কি আসবে?'

'আমি তোর জন্যে করেই মরব দেখছি।'

'যাও যাও সম্মোহন করে দাও, ডাক্তার নিয়ে এখুনি এসে যাবে লোকটা।'

লোকটার বিছানার কাছে ধীর পায়ে এগিয়ে যায় অসুরা। ভালো করে লক্ষ করে। না, অচৈতন্য নয়, মটকা মেরে পড়ে আছে।

সেই অপরূপ সুন্দরীর সাক্ষাৎ পাওয়ার বাসনায় সাহিল আজ আগের দিনের স্থানটিতে ভান করে অচৈতন্য হয়েছে। এখন তাকে তুলে আনা হয়েছে সেই ঘরে, সেই বিছানায়। অচৈতন্য হয়ে থাকার অভিনয়ে পড়ে আছে। কিন্তু চোখ মেলছে না, যাতে বুড়িটা জানতে পারে তার ভান। আর ছুঁড়িটা এসে তাকে চুমু খেতে পারবে তবে। যে দশায় আগের দিন খেয়েছিল। নিশ্চয় আছে ছুঁড়িটা, এক সময়, সময় বুঝে নিশ্চয় বেরিয়ে আসবে। আর তার ঠোঁটে চুমু খাবে, খাবেই। তেমনই পরিস্থিতি তৈরি করেছে সাহিল।

কেউ যেন কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। কে? সেই সুন্দরী? কপালে হাত রাখল। এ তো খসখসে হাতের স্পর্শ, শুধু হাড়, বুড়ির হাত।

আসুরা লোকটাকে সম্মোহন করার জন্য কাছে এসেছে। 'আপনার ঘুম ধরেছে, আপনি ঘুমিয়ে পড়ুন, আপনার সব চিন্তা মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলুন। আপনার ঘুম আসছে। আপনার মাথা ভারী হয়ে আসছে, কপাল ভারী হয়ে আসছে, চোখের পাতা ভারী হয়ে আসছে....'

বৃদ্ধার এই সব কথা শুনে আর হাত বুলোনোর মধ্যে বুঝতে পারল সাহিল, সে ধীরে ধীরে অচৈতন্য হয়ে পড়ছে। হাত নাড়াবার শক্তি হারিয়ে গেছে, পা নাড়াবার শক্তি হারিয়ে গেছে। এমনকি চোখের পাতাও খুলতে পারছে না। কোনো অন্ধকার অতলে তলিয়ে গেছে। তার কোনো চিন্তা নেই দুর্ভাবনা নেই। শান্ত হয়ে পড়ে আছে। শান্তিও পাচ্ছে সে। বুড়ি বুঝি কিছু বিদ্যা ফলিয়েছে তার ওপর। শান্ত হয়ে পড়েছে, শান্ত।

আর অন্য কেউ যেন তার বিছানায় এসেছে। মাথার কাছে। সেই নরম হাত কপালে রেখেছে। সেই নারী। অথচ সেই নারীকে দেখার জন্য আচ্ছন্ন দশা থেকে বেরোতে পারছে না। তেমনই পড়ে থাকে। বেরোবার চেষ্টাও করছে না সে, সেইভাবে পড়ে থাকতে তার ভালো লাগে। সে জানে সেই সুন্দরী এসেছে তার শিয়রে। আর কপালে আঙুল বুলোয়।

এই তো একটা চুমু খেল। একেবারে ঠোঁটে ঠোঁট দিয়ে।

দ্বিতীয় চুমুটা দেওয়ার আগে নানির দিকে তাকায় রিজি। যেন বলতে চায়, কিছু হবে না তো? জেগে উঠবে না তো? নানি অভয় দিল। দ্বিতীয় চুম্বনটা নামিয়ে দিল রিজি। জাগেনি মানুষটি। নিশ্চিন্তে দ্বিতীয় চুমু পর্যন্ত খেয়ে নিয়েছে। এবার

তৃতীয় চুম্বনের জন্য তৈরি হবে। আবার নানির দিকে তাকায়। নানির সম্মতি জানতে চায়। নানির চোখে অভয় অভিব্যক্তি।

সাহিল বুঝতে পারল তৃতীয় চুম্বনটা এবার দেবে সুন্দরী। এবার যদি চোখ খুলতে পারে? তৃতীয় চুম্বনটা নামিয়ে দিল সুন্দরী, সে চোখ খুলতে পারল না।

রিজি ছুটে গেল ঘরের কোণে ছোটো আলোর ছায়ায়। তার কাছে ছুটে যায় আসুরা। 'এবার লোকটার সম্মোহন খুলে দিই?'

'না, আর একটু পর।'

'কেন?'

'উত্তেজনায় জোরে জোরে শ্বাস পড়ছে আমার। শব্দ পাবে। একটু শান্ত হয়ে নিই।'

'তোর জন্যে এত করি, নানির অবদান মনে রাখবি তো?'

'থ্যাঙ্ক্যু নানি।'

আসুরা হাসে।

ক্রমশ রিজির শ্বাসের শব্দ কমতে থাকে।

বড় মানুষটির কাছে গিয়ে একটু দেখে আসুরা। দেখে বড় মানুষটার ঠোঁটে লিপস্টিকের রং লাগিয়ে দিয়েছে ছুঁড়িটা। ঘরের কোণে রিজির কাছে ছুটে যায় আসুরা। 'করেছিস কি, তোর ঠোঁটের রঙ মানুষটার ঠোঁটে এঁকে আছে!'

রিজি গাল হাঁ করে বড় বড় চোখ বের করে। তারপর কি ভেবে বলে, 'থাক। একটা কিছু সঙ্গে নিয়ে যাক।'

'তোর মনে ছিল না ঠোঁটে রং আছে?'

'মনে ছিল না।'

'কী মন তোর?'

'আমার এমনই মন।'

'শ্বাস আর একটু কমা, এবার মানুষটাকে জাগাব।'

'আর একটু।'

'তুই আজ এত উত্তেজিত কেন?'

'মানুষটাকে আবার পেয়েছি বলে।'

ছোটো আলোর ছায়ায় রিজিকে আবার লুকিয়ে পড়তে দিল। শ্বাস-প্রশ্বাসও তখন স্বাভাবিক হয়ে এসেছে।

বড় মানুষটার কাছে যায় আসুরা। একটু দেখে। একটু হাসেও। ঠোঁটে রং জ্বল জ্বল করছে। তারপর কপালে হাত ডলে। 'মালিক চোখ খুলুন, মালিক জেগে উঠুন।'

চোখ মেলে সাহিল। জেগে উঠেছে। সত্যিই অচৈতন্য হয়ে পড়েছিল। ঘাড় তুলে ঘরের ভেতরটা দেখে, নেই, এ ঘরে সুন্দরী নেই, দেখতে পেল না সে।

বাইরে তখন মোটরসাইকেলের আওয়াজ। ডাক্তার নিয়ে নিশার এসে গেছে।

২০. আঁতকে উঠল, 'ও মাগো!' তারপর ডুকরে উঠল।

সাহিল অসুস্থতার ভান করেছিল এবার। ম্যানেজার নিশার সেই ঝুপড়ি বাড়ি থেকে বের করে এনে পৌঁছে দেয় তার ফকিরপাড়ার দোতলা কোঠায়। সবাই জেগেছিল, সবাই জেনে গিয়েছিল মোবাইলের ফোনাফুনিতে। সাহিল দেখল নীচের গেটের সামনে বউ ফাহমিদা আর শালি জাসমিন এসে অপেক্ষা করে দাঁড়িয়েছিল।

সিঁড়ি ভাঙার সময় নিশার তাকে ধরে ধরেই নিয়ে যায়। ধরে নিয়ে যাওয়াতে বাধা দিতে পারেনি। এক মুহূর্ত মনে হয়েছিল নিশারের গালে একটা চড় কষায় এরকম তার আচরণের জন্য। আসলে সে তো অসুস্থ নয়, তাকে ধরে ধরে দোতালায় তুলবে কেন? পরমুহূর্তেই খামোশ খায়, এমনটা তার উচিত হবে না। সেই ভিখারিনির ঘরে সেই ভিখারিনির সাক্ষাৎ পাবে বলেই অসুস্থতা ও অজ্ঞান হওয়ার অভিনয় করেছিল। সে কথা নিশারকে জানানো উচিত হবে না। মনের কথা মনেই থাক। সুন্দরী ছিল, অথচ তার সঙ্গে দুচোখের মিলন হয়নি, এই ব্যর্থতা সে মনের মধ্যেই লালন করতে থাকল। এই বেদনা তার নিজের। কাউকে প্রকাশ করা যাবে না। নিজেকেই কষ্ট পেয়ে যেতেই হবে।

ধরে ধরে তার ঘরের বিছানায় শুইয়ে দিল নিশার। ডাক্তার দেখে গেছেন, শরীরের সবকিছু ঠিকঠাক আছে। ঠিক থাকবারই কথা। শুধু একটাই পরামর্শ তিনি দিয়েছেন কয়েকদিন বিশ্রাম নিতে।

অসুখ তার কিছু হয়নি, অজ্ঞান সে হয়নি, ডাক্তারের পরামর্শ তার প্রয়োজনে লাগবে না। এমনিতেই সে সেই ভিখারিনির সাক্ষাৎ না পাওয়ার দুঃখে কদিন ব্যাবসাক্ষেত্রে যেতেই পারবে না। ববং তার ভিক্ষা-যাত্রার পেছনে পেছনে গিয়ে তার সাক্ষাৎ লাভ করার অভিযানে যাওয়াই তার পক্ষে ঠিক হবে। সে ফকিরপাড়ার পুরুষ, সে, এক স্ত্রী বর্তমান অবস্থায় দ্বিতীয় স্ত্রী আনতে পারবে না, এই ভিখারিনির উদ্দেশ্যে যাত্রা তার প্রেমাভিসার, আর কিছু নয়। এই অর্থহীনতা সে আশঙ্কা করছে।

নিশার প্রায় জোর করে শুইয়ে দেয় বিছানায়। তফাতে দাঁড়িয়ে দেখছে ফাহমিদা ও জাসমিন। এখনও সে নিশারের আয়ত্তাধীন আছে বলে হস্তগত [illegible]র অধিকার পায়নি তারা। তাই তারা এখনও তফাতে আছে। তাকে নিয়ে তা[illegible] আবেগ ও সম্পর্কের খেদ এখনও তারা প্রকাশ করতে পারেনি।

নিশার বলল, 'মালিক, আপনাকে সাবধানে থাকতে হবে।'

নিশার বিছানায় শুইয়ে দেবার পরই সাহিল উঠে বসে। বলল, [illegible]ন, আমার কী হয়েছে?'

'আপনি আজও অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলেন।'

'বেশ করেছি, তুই এবার যা। আমি আমার কথা ভালো বুঝি।'

'আপনার অসুস্থতার ব্যাপা[illegible]'—

'আমি সুস্থ কি সুস্থ নই, আমি ভালো বুঝি। তুই এখান থেকে যাবি!'

নিশার ভাবল মালিক তার ওপর কোনো কারণে খেপেছে, এই মুহূর্তে এখানে সে থাকে, মালিক চায় না। পেছন ফিরে দেখল মালিকের বউ আর শালিকে। তাদের আশ্রয়ে শান্তি পেতে চায় বোধহয় মালিক, সে বরং বিলম্ব করে দিচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে সে ছিটকে বেরিয়ে যায় ঘর থেকে। রাত হয়েছে, বাড়ি ফিরে যেতে হবে তাকে। তার বাগনানে বাড়ি। প্রতিদিন মালিককে মোটর সাইকেলে নিয়ে যাওয়া ও ফিরিয়ে দেওয়া করে থাকে সে।

নিশার বেরিয়ে যাওয়ার পর ফাহমিদা আর জাসমিন তার দিকে এগিয়ে আসছে দেখে সাহিল বিছানায় ক্লান্তিতে শুয়ে পড়ে। সত্যিই যেন তার অসুখ। গভীর অসুখ। সে তো সাক্ষাৎ পায়নি সেই সুন্দরী ভিখারিনির। অথচ তার নানি সাহিলকে সম্মোহন করেছে, অচৈতন্য করেছে, আর তিনটি চুম্বন করছে সেই রমণী। সে সুন্দরী মাদারি ফকির বংশের কন্যা। তার আজও দেখা পায়নি। ব্যর্থতায় ভরে আছে মন ও শরীর। কন্যা চুম্বন করেছে, অথচ তার সাক্ষাৎ পায়নি, এ ব্যর্থতা তাকে কম কষ্ট দিচ্ছে না। এসব কথা জানে না বউ শালি। তারা ভাবে সে খুব অসুস্থ। সে কেমন অযত্নে থাকা ধুলো পড়া আরশির মতো মলিন হয়ে পড়েছে। যেন নিয়তি-তাড়িত হয়ে সেই সুন্দরীর সাক্ষাৎ পাচ্ছে না। এটা তার ভবিতব্য। এই অমিলন সে ঘোচাতেই চায়। ভিখারিনি সুন্দরীর দেখা পাবে সে। সে হয়তো তার সঙ্গে কথা বলবে। কী কথা বলবে জানে না, কী সম্পর্কে যাবে জানে না। তবে নিশ্চিত করে জানে সে-নারীটিকে সে বিয়ে করবে না।

ফাহমিদার বর্তমানে আর কোনো রমণীর পাণিগ্রহণ করার অধিকার নেই তার। ফকিরপাড়ার মানুষটি যে স্বেচ্ছায় ত্যাগ করেছে। অথচ সুন্দরীর সঙ্গে সে দেখা করবে, কথা বলবে। একে হয়তো প্রেমে পড়া বলে। প্রেমেই পড়ছে সে। প্রেমের আর এক রূপ তার মধ্যে প্রস্ফুটিত হয়েছে। যাকে ছোঁয়া যায় না, দেখা যায় না, যার গন্ধ নেওয়া যায় না। যা বুকের মধ্যে আবিষ্ট রাখে। এই কথা ওরা কেউই জানছে না। সুন্দরী আজও সাক্ষাৎ দেয়নি। কীভাবে যেন ছলচাতুরি করে নিজেকে আড়াল রেখেছিল, অথচ কার্যসিদ্ধি পূরণ করেছে।

এই ব্যর্থতায় সাহিল অসুস্থ হয়ে পড়তেই চায়। ফাহমিদা ভাবছে, শালি জাসমিন ভাবছে সে অসুস্থ। হ্যাঁ সে অসুস্থ। খুব ভোরে ঘর ছেড়ে, সেই ভিখারিনি ভিক্ষে করতে বেরিয়ে যায় গ্রাম-গ্রামান্তরে। তার যাওয়ার পেছন পেছন গেছে সাহিল, কিন্তু তার যাওয়া ব্যর্থ হয়েছে, খুঁজে পায়নি ভিখারিনিকে। যার নাম রিজি। সে খুব সুন্দরী। আর যুবতী। আর সে প্রতিদিন পশ্চিম থেকে পুবের দিকে চলে যায়। পুবে সূর্যের আলোর দিকে তার যাত্রা, ফিরে আসে অস্তমিত সূর্যের গতির ভিতর। এই আলো আঁধারের খেলায় যেন কোনো অলৌকিক নারী প্রকাশ্য হয়ে পড়ে, তার প্রকাশ ও দৃশ্যহীনতা যেন পৃথিবীর আহ্নিকগতি ও সূর্যের আলোর বিভিন্ন এক রূপকথার নারীকে রচনা করে। সে হয়তো কোনো কল্পনা, শুধু কল্পনা দিয়ে গড়া এক সুন্দরী নারী।

যা সূর্যের আলোছায়ার ভিতর উপ্ত হয়, তারপর তার মৃত্যু হয়। তার উপস্থিতির অনুভব সত্যি হয়ে ওঠে, যেন জীবনের কাজে লাগে। এই যে তার বাঁচা, বাঁচায় কাজে লাগছে।

আবার কি যাবে সেই নারীর সন্ধানে? যেতেই হবে। ব্যর্থ হলেও কি যাবে? ব্যর্থ হলেও তাকে যেতে হবে। যেতেই হবে। যাওয়া ছাড়া কোনো উপায় নেই। অথচ সে নারীকে সে অধিকার করবে না। সম্ভোগেও যাবে না। প্রেম নিবেদন করবে, তার তারিফের কাছে সে সমর্পিত হবে, তার রূপের সুধা পান করবে। পৃথিবীর আবর্তনের ভিতর আলোছায়ায় এক নারীর অদৃশ্য হওয়া ও দৃশ্যমান হওয়ার গল্পটা সে নিজেই তৈরি করে নাকি? হয়তো। চৈতন্যের এই রসায়ন জানে না সে। সে যেন চৈতন্যের হাতে চালিত হয়েছে। সে অর্থসম্পন্ন এক মানুষ। তার অভাবের অপূর্ণতার ইঙ্গিত যেন এই নারী। সে নারী ভিখারিনি। এমন বিপ্রতীপতা এমনই অসাম্যের সূত্র এখানে। সাহিল ধরতে চায় সে ভিখারিনিকে, ভিখারিনি ধরা দিয়েও ধরা দেয় না। কীভাবে লুকায়, কীভাবে মায়া তৈরি করে, কীভাবে ছলচাতুরিকে মায়া দিয়ে প্রতিষ্ঠা করে, লুকিয়ে পড়ে, তা ধরতে পারে না, সাহিলের তা দৈন্য। ভিখারিনির কাছে হেরে যাচ্ছে? হায়!

অসুস্থ নয় সে, অথচ অসুস্থদশায় শুয়ে আছে। যেন তার অসুখই। বউ ও শালি তেমনই বুঝছে। বুঝুক। ভিখারিনির সাক্ষাৎ না পাওয়ার ব্যর্থতায় অসুস্থদশায় সে থাকতেই চায়। সে খুব অসুস্থ, খুবই অসুস্থ।

ফাহমিদা-জাসমিন কিছুই জানে না। ওদের কাছে গোপন রেখেছে, গোপনই রাখতে চায়। ওরা তার অসুস্থতা বুঝছে।

নিশার চলে যাওয়ার পর তফাতে দাঁড়িয়ে ফাহমিদা ও জাসমিন পরিস্থিতি বুঝতে চাওয়ার ভিতর খানিকটা কালক্ষেপ অবলম্বন করেছিল। যেমনভাবে মানুষ দূর থেকে সাপ দেখে। তারপর মনে হয়েছিল এবার কাছে যাওয়া যায়। কে প্রথম আসবে তা নিয়ে একটু গড়িমসি নিজেদের মধ্যে। আর ফাহমিদাই এগিয়ে আসছে। আহ্ কী আরাম ফাহমিদার প্রথম এগিয়ে আসার ভিতর। ফাহমিদা তো তার বউ। তারই এগিয়ে আসার কথা। জাসমিনের প্রথম এগিয়ে আসার মধ্যে স্বস্তি-শান্তি ছিল না। অনধিকার, ষড়যন্ত্র ছিল। সেই ষড়যন্ত্রের হাতে পড়তে চায় না সাহিল। ফাহমিদা বরং কপালে একটু হাত বুলিয়ে দিলে শান্তি পাবে। ফাহমিদা কাছে এসে কোনো জীব মরে গেছে কি বেঁচে আছে, দেখার মতো নীচু হয়ে তার দিকে দেখল, আর আঁতকে উঠল 'ও মাগো!' তারপর ডুকরে উঠল।

২১. ছিঃ আপনার রুচি এত নীচে নেমেছে!

ফাহমিদা ছোটো বোন জাসমিনকে নিয়ে নীচে নেমে এসেছিল। তারপর সাহিলকে নিশার দোতালায় তোলে। বিছনায় তুলে দেয়। বিছানায় নিশ্চুপ হয়ে পড়েছিল তার স্বামী। নিশারও বেরিয়ে যায়। লোকটা আবার অসুস্থ হল? নাকি অন্য কিছু ঘটিয়েছে?

খানিকটা তফাত থেকে বোনকে নিয়ে অল্প সময় পর্যবেক্ষণ করেছিল ফাহমিদা। কী জানি লোকটার কী হয়েছে। টাকা পয়সা করল। আর সেও কেমন মুটিয়ে গেল। নিজের শরীর আর সামলাতে পারে না ফাহমিদা। স্বামীকে সুখ দিতে পারে না। আর একটা বিয়ে করলেই পারে। কোনো আপত্তি করবে না ফাহমিদা কিন্তু দুঃখ নিশ্চিত পাবে। তবে দুঃখ খানিকটা কমবে, যদি জাসমিনকে বিয়ে করে। দুই বোন এক সংসারে থাকা যাবে। অন্য কোনো নারী এসে সংসারে ভাগ বসালে খুব কষ্ট পাবে। তেমন কী কোনো ঘটনায় যাচ্ছে তার স্বামী, আজকের অসুস্থতা, তারই কী কোনো ইঙ্গিত বহন করছে? দূরে দাঁড়িয়ে বুঝবার চেষ্টা করল। তারপর যেই ভাবল, মানুষটা সত্যি সত্যি তো অসুস্থ হতে পারে, তখনই এগিয়ে গেল সে। কাছে গিয়ে নীচু হয়ে মুখের দিকে দৃকপাত করেই আঁতকে উঠছে। 'ও মাগো!' সর্বনাশ হয়ে গেছে তার। স্বামীর ঠোঁটে লিপস্টিকের রং লেগে আছে। যা আশঙ্কা করেছিল, তাই হয়েছে। সর্বনাশ হয়েছে তার।

সঙ্গে সঙ্গে জাসমিনও এগিয়ে যায়, বড়োবুবুর দেখার ইঙ্গিত খুঁজে দেখতে পায় তার দুলাভাইয়ের ঠোঁটে লিপস্টিকের রঙ। কড়া কণ্ঠে প্রশ্ন করে ওঠে, 'কোথায় গিয়েছিলেন আপনি?'

জাসমিনের অগ্নিবর্ষী কণ্ঠোৎসারিত প্রশ্ন শুনে চমকে চোখ মেলে তাকায় সাহিল, যেন ভূমিকম্পের খবর বলছে।

আবার বলে জাসমিন, 'কোথায় গিয়েছিলেন আপনি?'

ফাহমিদা পাশে দাঁড়িয়ে মুখে আঁচল দিয়ে কাঁদছে।

সাহিল পাল্টে প্রশ্ন করল, 'কেন, কী হয়েছে?'

'আপনি সত্যি কথা বলুন।'

'মানে?'

'আপনি লুকোবেন না!'

'কী লুকোব?'

'আপনি জানেন না? ন্যাকা সাজবেন না। যা সত্যি তাই বলুন।'

'কী সত্যি বলব?'

'আপনি কোনো নারীর সঙ্গে আজ মিলিত হননি?'

'না।'

'ভেবে বলুন'

'কোনো নারী মিলিত হয়ে থাকতে পারে, আমি মিলতি হইনি।'

'ছিঃ কথার কী বাহার, কথাতে লুকোচ্ছেন কেন। আপনার অপরাধ তাতে অপ্রমাণ হয় না।'

'কি বলছ জাসমিন, আমার অপরাধ!'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, কোনো নারীর সঙ্গে মিলিত হয়েছেন আজ, সেই অপরাধ গোপন

করছেন।'

'কী বলছ কী?'

'সত্য কথা বলুন। তাকে বিয়ে করেছেন?'

'কাকে?'

'যার সঙ্গে মিলিত হয়েছিলেন?'

'বিশ্বাস কর, আমি তার সাথে মিলিত'—

'আপনার ঠোঁটে লিপস্টিকের রঙ জ্বল জ্বল করছে।'

'তাই নাকি?' ঠোঁটে হাত দেয় সাহিল। রঙ ছোঁয়ার চেষ্টা করে। রঙের ছোঁয়ায় তর্জনি বুলিয়ে রঙের ছোঁয়া একভাবে পায়। সে স্পর্শ তো মনেই তৈরি হয়। মন যদি বলে পেয়েছি, তাহলে পেয়েছে। স্পর্শ পেলই যেন সে। সেই ভিখারিনি তার অচৈতন্যদশায় তাকে চুমু খেয়েছিল। সে ঠোঁটে যে লিপস্টিকের রঙ ছিল, তা তার কল্পনাতে ছিল না। আর এখন তার ঠোঁটে রঙ দেখে ফাহমিদা ডুকরে কাঁদছে, জাসমিন অগ্নিপ্রশ্নে মেতে উঠেছে। প্রমাদ গুণল সাহিল। ঠোঁটের রঙের বাস্তবতা তার মনে তৈরি হলে সে একভাবে প্রস্তুত থাকত। এখন সে একেবারে ধরাশায়ী হয়ে গেছে।

'কে সে?' জাসমিন আবার প্রশ্ন করল।

'এক ভিখারিনি।'

'মিথ্যে বলবেন না?'

'সত্যি বলছি, সে ভিখারিনি, কিন্তু'—

'কিন্তু কী?'

'কিন্তু সে ভিখারিনির দেখা কোনোদিন পাইনি, যদিও ঠোঁটে এই যে রং, এই রঙ কিন্তু সেই ভিখারিনির ঠোঁটের।'

'আপনি কি কাপুরুষ, যে মিথ্যার দরকার হয়?'

'বিশ্বাস কর, আমাকে অচৈতন্য করে সে চুমু খেয়েছে।'

'বিশ্বাস করি না আমরা।'

'দ্বিবচনে বলছ কেন, ফাহমিদা নিশ্চিত বিশ্বাস করবে।'

ফাহমিদা বলল, 'তুমি বিশ্বাঘাতক!'

জাসমিন বলল, 'ছিঃ আপনার রুচি এত নীচে নেমেছে? আপনি ভিখারিনির সঙ্গে মিলিত হয়েছিলেন!'

'বিশ্বাস কর, আমি মিলিত হইনি।'

ফাহমিদা বলল, 'আসল কথা জেনে নে, তাকে বিয়ে করেছে কিনা, আমাদের কপাল পুড়েছে কিনা!'

এবার বিছানায় লাফিয়ে উঠে বসে সাহিল, 'আবার দ্বিবচন, আমি যদি সেই ভিখারিনিকে বিয়ে করে থাকি, তাহলে জাসমিনেরও কপাল পুড়বে কেন?'

জাসমিন অগ্নিবর্ষী কণ্ঠে বলল, 'সে কথা আপনি ভালো করেই জানেন। আপনার

নীচতা আছে আমাকে নিয়েও।'

ফাহমিদা বলল, 'ওসব কথা রাখ, আগে বল সে মেয়েকে বিয়ে করেছে কিনা?'

'তোমাকে নিয়ে কোনো নীচতা ছিল না জাসমিন, একবার শুধু বিভ্রম তৈরি হয়েছিল, ভুল করে ফাহমিদা ভেবেছিলাম।'

'আহ্, ওসব কথা রাখ না জাসমিন, তুই আগে শুধা, তাকে বিয়ে করেছে কিনা!'

'বলুন, বলুন?'

'আমি বলব না।'

'আপনার সৎ সাহস নেই কেন? ভীরু, কাপুরুষ!'

'বলছি তো, তার সঙ্গে আমার দেখাই হয়নি।'

'অথচ ঠোঁটে লিপস্টিকের রং!' ক্রুর হাসি হাসে জাসমিন কোনো দক্ষ অভিনেত্রীর মতো।

'এমন বললে আমি আত্মহত্যা করব কিন্তু।'

ফাহমিদা হাত ধরে বলল, 'বিয়ে করেছ, কি করনি হ্যাঁ অথবা না বলে দাও না।'

'না।'

আবার ক্রুর হাসি হাসছে জাসমিন। 'বিয়ে না করে মিলিত হয়েছিলেন, ছিঃ!'

ফাহমিদা এই কথায় শান্ত হয়েছে। কিন্তু জাসমিনের চোখে তেমনই ক্রুর হাসি, তেমনই শ্লেষ ঝরে পড়ছে।

২২. খুঁজে বের করতে হবে সেই ভিখারিনিকে।

ছেলেমেয়ে ও সাহিলকে আগে খাইয়ে দিয়েছিল। তারা যে-যার শুয়ে পড়েছে। কাজের মেয়েও শুয়ে পড়েছে। ছেলেমেয়ে দোতলায় দুটি ঘরে শোয়। আর ফাহমিদা সাহিল একটি ঘরে। পাশের ঘরে জাসমিন শোয়। নীচের তলায় একটি ঘরে কাজের মেয়ে শোয়। সেখানেই রান্নাঘর। একটা ঘরে ধান-চাল ঠাসা।

রাত হয়েছে। সাহিল শুয়ে পড়েছে।

দুই বোনে খাওয়া দাওয়ার পর এক ঘরে এল। জাসমিনের ঘরেই এল ফাহমিদা। জাসমিনের সঙ্গে ফাহমিদার অনেক কথা আছে। কাজের লোক শুনে ফেলবে খাওয়ার ঘরে বলা যায়নি। আর জাসমিনেরও অনেক প্রশ্ন, অনেক প্রতিবাদ।

জাসমিন মানুষটাকে ভালোমানুষ বলেই জানত। নির্লোভী, সদাচারী, উদার মনের। তার যে পেটে পেটে এতকিছু, সেজন্য এত আশাহত হয়ে তেতে উঠেছে। কোন্ মানুষকে বিশ্বাস করবে তাহলে সে? অনেক পুরুষের চোখের দিকে তাকালেই বোঝা যায় বদ। তাদের প্রবৃত্তিগুলোকে গড় গড় করে পড়ে ফেলা যায়। সে তো স্পষ্ট, প্রকাশ্য। কিন্তু এমন ভালোমানুষি আচরণের স্বভাবের ভিতর এমন কদর্যরূপ তো কল্পনা করেনি। সত্যিই দুলাভাইকে নিয়ে ভয়ানক সমস্যায় পড়েছে। আর তার থেকে উদ্ধার পেতেই হবে। না হলে সংসার ছারখার হয়ে যাবে। বুবু পথের ভিখিরি হতে

কতক্ষণ! সমূহ বিপদের আলামত পেয়েছে সে। দুলাভাইয়ের ঠোঁটে কিনা একজন নারীর ঠোঁটের রঙ? কতদূর নেমে গেছে দুলাভাই। এরপর তাকে বাড়িতে এনে তুলবে। বিয়ে করে বিবির মার্যদা দেবে। বিবির এলদার বেলদাররাও ঢুকবে। এত যে সম্পত্তি, এত যে কারবার সম্পদ সব বেহাত হয়ে যাবে। বুবুকে দুলাভাইয়ের পায়ের কাঁটা, চোখের বালি করতে কতক্ষণ! তারপর তাকে ছুঁড়ে ফেলে দেবে আস্তাকুঁড়েয়। সব কিছু ধূলিসাৎ ধ্বংস হয়ে যাবে।

এখনও বিয়ে করেনি। এখনই সর্বনাশের পথ থেকে ফেরাতে হবে লোকটাকে। কিন্তু কীভাবে? সমাধান একটাই, দুলাভাই যদি বিয়ে পাগল হয়, তাহলে তাকেই বিয়ে করুক। বুবু বাঁচবে, সংসার রক্ষা হবে। জামাইবাবুকে ফেরাবার এই একটি উপায়।

ফাহমিদা চাইছিল, জাসমিন এতখানি তার স্বামীকে অভিযুক্ত না করে। এতখানি অভিযোগ-প্রতিবাদী হয়ে উঠলে তার স্বামী যদি বিগড়ে যায়। তাকে কাকুতি-মিনতি করে সর্বনাশের পথ থেকে ফেরাতে হবে। সে যদি আর একটি বিয়ে করতে চায়, জাসমিনকেই বিয়ে করবে। চটিয়ে ফেরানোর পন্থা নিলে চলবে না।

ফাহমিদা বলল, 'তুই অত মানুষটার ওপর চোটপাট করিস না বোন!'

'চোটপাট করব না! কত বড়ো দুঃসাহস।'

'এভাবে আহত করছিস কেন?'

'মিন মিন করব নাকি শুনি!'

'বন্ধু বিগড়ে যদি যায়!'

'কত বড়ো সাহস দেখ, ঠোঁটে লিপস্টিকের রঙ!'

'একবার অন্যায় করে ফেলেছে।'

'রক্তের স্বাদ পায়নি বলতে চাও।'

'ললিয়ে কলিয়ে ফেরাতে হবে।'

'তোমার মিন মিন স্বভাব মিন মিন করো গে যাও। কলাগাছ কাটতে কাটতে ডাকাত হয়ে উঠবে।'

'আমার মনে হয় অন্যায় এই প্রথম করে ফেলেছে। বুঝিয়ে সুঝিয়ে ফেরাতে হবে।'

'আমার তা মনে হয় না'। খুবই ক্ষুব্ধতা দেখায় জাসমিন।

ফাহমিদা জাসমিনের কপালে মুখে হাত বুলিয়ে শান্ত করার চেষ্টা করে।

'আমি জানি, ও আমার স্বামী। ওকে অনেকদিন আমি চিনি। খুব খারাপ স্বভাবের মানুষ ও নয়। পাকে চক্রে পড়ে কিছু একটা গোলমাল করেছে। বোঝালে মতি ফিরে আসবে।'

'বলছ?'

'এছাড়া তো অন্য পথ দেখতে পাই না। বরং রাগ দেখালে বন্ধু বিগড়োবে।'

'দেখো।' জাসমিন শান্ত হয়ে পড়ে।

ফাহমিদা বলল, 'তুই আর কী ভাবছিস?'

'ভাবছি, কে সেই মেয়ে, যাকে ভিখিরি বলছে? যার ঠিক ঠিক পরিচয়, ঠিকানা জেনে নিতে হবে।'

'ভিখারিনির এত সাহস হয় কোথা থেকে?'

'তুমি কি কোনো ভিখারিনিকে কোনোদিন এ বাড়িতে আশ্রয় দিয়েছিলে?'

'না, না তো।'

'কোনো অল্পবয়সী কাজের মেয়ে, যে কি না পরবর্তী সময়ে ভিখারিনি হয়ে যেত পারে?'

'তেমন তো কোনোদিন ঘটেনি। সব সময়েই বয়স্ক কাজের মেয়ে থেকেছে।'

'খুঁজে বের করতে হবে সেই ভিখারিনিকে।'

'কোথায় খুঁজবি?'

'ভেবে দেখতে হবে।'

'চোটপাট করে কোনো লাভ হবে না।'

'ঠিক আছে তোমার কথা শুনব। কত রাত হয়েছে?'

'রাত অনেকটাই হয়েছে। আমার ফিরে যেতে ইচ্ছে করছে না ওর বিছানায়।' কথাটা বলে জাসমিনের হাত ধরে হু হু করে কেঁদে ফেলে ফাহমিদা। গভীর রাতের ভিতর একরাশ কান্না একরাশ অশ্রু ঢেলে দেয় ফাহমিদা। রাত যেন টের পায় এই কান্না ও অশ্রুর স্পর্শ।

পাশাপাশি শুয়ে অনেকক্ষণ জাসমিনের হাত ধরে কেঁদেছিল ফাহমিদা। একসময় কখন জাসমিন ঘুমিয়ে যায়। আর ফাহমিদা ফিরে যায় সাহিলের কাছে। সাহিল তখন গভীর ঘুমে আছে। চারদিকে নৈঃশব্দ। রাতের শব্দে ভরে আছে চারপাশ। অস্থির হয়েছে ফাহমিদা। মনটা খুবই অশান্ত, বিক্ষিপ্ত। অন্য রাতগুলো কী সহজে ঘুমিয়ে পড়ে। আজ কিছুতেই ঘুম আসছে না তার।

২৩. আপনি ফকির বিদ্রোহের কোনো ফকির?

মেঠো পথে দূরের বাঁক থেকে একটা ধুলোর ঝড় যে ছুটে আসছে। গ্রামের সবচেয়ে প্রবীণ ও মুরুব্বি মানুষটা সেদিকে তাকিয়ে আশ্চর্য হলেন। পাড়ার মসজিদ লাগোয়া পুকুর ধারে বাঁশের বেঞ্চে আরও কয়েকজন নানা বয়সের পুরুষ বসেছিল। প্রবীণ মানুষটি আঙুল তোলেন সেদিকে। অন্য পুরুষদের সেদিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করতে ইশারা করেন। সত্যিই একটা ধুলোর ঝড় রাস্তা বরাবর এগিয়ে আসছে। সকলে আশ্চর্য চোখে কৌতূহলে সেদিকে তাকিয়ে থাকে। তাহলে কি ঝড় আসছে? আশপাশে তো ঝড়ের কোনো প্রবাহ নেই, গাছপালা শান্ত ও নির্ভার।

তখন গোধূলি লগ্ন। আর সামান্য কিছু পরে মসজিদে মগরেবের আজান হবে, তারপর নামাজ পড়বে সকলে। সব পুরুষরা, পুকুরের তালগুঁড়ির ঘাটে ওজু করেছে।

এখন অপেক্ষায় আছে আজানের, নামাজের ওয়াক্তের। মসজিদের খাদেম যিনি, যিনি ইমাম তিনি মসজিদে উঠে গেছেন। তিনি সময় বুঝে আজান দেবেন। তারপর এই পুরুষরা মসজিদে গিয়ে কাতারে দাঁড়িয়ে নামাজে সামিল হবেন।

ধুলোর ঝড়টা রাস্তা ধরে বরাবর এগিয়ে আসছে। কিছুক্ষণ পরেই শোনা গেল অশ্বক্ষুরধবনি। একজন অশ্বারোহী আসছেন ধুলোর ঝড় তুলে। কে? ইংরেজ সৈন্য? না কোনো গোরা? না ইংরেজ রাজ কর্মচারী? সবাই তটস্থ হয়ে পড়ল। প্রবীণ দাড়িতে হাত বুলিয়ে বললেন, 'যে যেমনভাবে আছ, থাকো। অকারণে ভয় পেও না। আগে দেখ, কে আসে। আমি কাল রাতে এক আশ্চর্য স্বপ্ন দেখেছি। আমাদের হালের বলদগুলো ডানা মেলে আকাশে উড়ে বেড়াতে দেখেছি। যা এই মুহূর্তে ঘটতে চলছে, তা হয়তো আশাব্যঞ্জক কিছু। আমি যেন তার আলামত পেয়েছি।'

পরমুহূর্তে দেখা গেল একজন অশ্বারোহী ছুটে আসেছেন এদিকে। অশ্বারোহীর উদ্দেশ্য এদিকেই। তিন সটান আশরফপাড়ার মসজিদের বাঁশের পাটাতনের সামনে অশ্ব থামালেন।

পাটাতনে যারা বসেছিল তারা নীচে নেমে দাঁড়িয়ে চিত্রার্পিত হল।

যিনি অশ্ব থেকে নামলেন তাঁর সুফি লেবাস অঙ্গে। মাথায় পাগড়ি। আর কোমরে ঝুলছে তরোয়াল। মনে হল ক্লান্ত তিনি। চোখে মুখে পথশ্রমের ক্লান্তি। তিনি আশরফ পাড়ার নানা বয়সের পুরুষদের সামনে দাঁড়িয়ে ডান হাত তুলে মহব্বতের সঙ্গে 'আসসালোমো আলাইকুম' বললেন।

ভীত সন্ত্রস্ত মানুষজন খুশি হয়ে উঠে সালামের প্রত্যুত্তরে 'ওয়ালাইকুম আসসালাম' বলল। কেন না আগন্তুক গোরা সৈন্য বা ইংরেজ রাজকর্মচারী নয়।

পাড়ার প্রবীণ আসাদুল্লা তখন পুরুষের দল থেকে বেরিয়ে গিয়ে তাঁর কাছে এগিয়ে গেলেন।

সেই মাঝবয়সী যোদ্ধা আসাদুল্লার হাত ধরে মোসাফা করলেন। তারপর তাঁর সঙ্গে কোলাকুলি করলেন।

তারপর ঘোড়াটাকে বেঁধে দিলেন একটা নিমগাছে।

তারপর তিনি সোজা উঠে গেলেন মসজিদের সিঁড়িতে। সিঁড়ির সব কটা উঠতে পারলেন না, বসে পড়লেন মাঝখানে।

এগিয়ে গেলেন আসাদুল্লা। 'আপনার কি খুব কষ্ট হচ্ছে?'

'আমি যুদ্ধ করে করে ক্লান্ত।' চোখে মুখে কষ্টের যন্ত্রণা। 'নামাজের ওয়াক্ত হয়ে এসেছে, আমাকে কি কেউ একটু ওজুর পানি দেবেন?'

মসজিদের ওপরেই বদনাভরা পানি ছিল, আসাদুল্লা বাড়িয়ে দিলেন।

তিনি প্রথমে পাগড়ি খুললেন। তারপর পাগড়ির কোণ দিয়ে মুখের ঘাম মুছলেন। তারপর ওজু করলেন। পা ধুলেন পানি দিয়ে। তাঁর চোখে আশ্চর্য দীপ্তি। ক্লান্ত, বড়োই ক্লান্ত তিনি।

ওজু শেষ করার পর আসাদুল্লা তাঁকে হাত ধরে তুললেন। নিয়ে গেলেন মসজিদে। শুধোতে গেলেন—'আপনি'।

'আমি আল্লার এক ক্ষুদ্র খাদেম। ফকির। ইংরেজ সৈন্যদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে করতে ক্লান্ত হয়েছি। আমার এখন বিশ্রাম নেবার সময়। যুদ্ধ শেষ হয়ে গেছে।'

'আপনি ফকির বিদ্রোহের কোনো ফকির?'

'আপনারাই জানবেন, আর কেউ না জানে। আপনার পাড়ায় আমি আশ্রয় ভিক্ষা করছি।'

'আলহামদোলিল্লাহ, কী সৌভাগ্য আমাদের। আমি কাল রাতে আশ্চর্য স্বপ্ন দেখেছিলাম।'

'আপনারা আমার আশ্রয়দাতা বাবা, আপনাদের মঙ্গল হবে। খোদা আপনাদের খায়ের করবেন।' তিনি এতই পিপাসার্ত যে বদনার পানি খানিকটা খেলেন।

পাড়ার অন্য সব পুরুষরা সামনে এসে নত হয়ে তাঁকে দেখছিলেন। তিনি তাদের দোওয়া করছিলেন। তাঁর শান্ত সৌম্য প্রসন্ন দৃষ্টি। ফকির তিনি, যুদ্ধে গিয়েছিলেন, এখন যুদ্ধক্লান্ত। অমলিন মুখশ্রী ক্রমশ আলোকিত হয়ে উঠছে। নিষ্পাপ সারল্য ভরা তাঁর চাহনি। ফকির বললেন, 'ওই নিমগাছটার নীচে আমি থাকব। যেখানে ঘোড়া বেঁধেছি।'

আসাদুল্লা বললেন, 'তাই হবে। আমরা গায়ে-গতরে খেটে আপনার ঘর তৈরি করে দেব।'

'আমি ক্ষুদ্র মানুষ, ক্ষুদ্র একটা আশ্রয়ের দরকার।'

'আমরাও দরিদ্র চাষি মানুষ, আমাদেরও দেওয়ার মতো বেশি কিছু নেই।'

'দিলটা তো আছে?'

'জি, সেটাই আমাদের সম্পদ।'

'তাহলেই হবে।'

'আপনি কী ক্ষুধার্ত?'

'হ্যাঁ, আল্লার এবাদতের জন্য।'

আজানের সময় হয়ে গেছে। অমনি মুয়াজ্জিন আজান দেন। সেই ফকির সিদ্ধপুরুষটি আজানের সালাম দিতে থাকেন।

২৪. আপনি মিথ্যাচারী শুধু নন, কপটও।

আজানের শব্দে ঘুম ভেঙে যায় সাহিলের। মনে করতে পারল সে এতক্ষণ স্বপ্ন দেখছিল। আর স্বপ্নটা এমন বাস্তবের রঙে ছোপানো নিজেরই বিশ্বাস হচ্ছে না, সে স্বপ্ন দেখছে ফকিরপাড়ার ফকিরের আগমনকে নিয়ে। যেন সেই দিনটির দৃশ্যে সাহিল ফিরে গিয়েছিল। যেন সে নানা বয়সের পুরুষ মানুষদের দলের একজন পুরুষ ছিল। ঘোড়া ছুটিয়ে আসতে দেখেছে ফকিরকে। ঘোড়া থেকে নামতে দেখেছে ফকিরকে। তারপর নিমগাছে ঘোড়া বাঁধার ঘটনাও সত্য। ফকির মসজিদের সিঁড়িতে বসে ওজু করেছেন। তারপর আসাদুল্লার সঙ্গে কথোপকথনের সব কথা শুনেছে।

চিমটি কেটে দেখে। সে এই সময়ে আছে, না ইতিহাসে ফিরে গেছে? সে সময়

ফকির বিদ্রোহ স্তিমিত হয়ে এসেছে। এক ফকিরযোদ্ধা নেতা ঘোড়া ছুটিয়ে আশরফ পাড়ায় এসেছিলেন। আমৃত্যু সেখানেই থেকেছিলেন। আর এ পাড়ার মানুষজন তাঁর অনুসারী হয়েছিলেন। আর তাঁর নামেই পাড়ার নাম হয় ফকিরপাড়া। তাঁকে নিয়ে পাড়ার কিংবদন্তির জন্মও হয় নানা। তাঁর তিনটি নিষেধ যেমন ছিল তেমনি তিনটি বরও এ পাড়ার জন্য তিনি দিয়েছেন।

এই পাড়ার সাহিল কি পারে এক স্ত্রী বর্তমানে দ্বিতীয় বিয়ে করতে? পারে না, কখনোই পারে না।

গতরাতে ভিখারিনির ঝুপড়ি থেকে নিজের বাড়িতে যে সমস্ত ঘটনা ঘটে গেছে, সমস্ত আনুপূর্বিক মনে করে সাহিল। খুবই অসন্তোষজনক ঘটনা ঘটে গেছে। প্রথমত ভিখারিনির চুম্বনের চিহ্ন ঠোঁটে নিয়ে যে বাড়িতে এসেছিল, তাতে ফাহমিদা ও জাসমিনের মুখোমুখি প্রশ্নের সামনে তার গৌরব-হানি হয়েছে। তার বিরুদ্ধে বিস্তর লাম্পট্যের অভিযোগ আনা যায় তাতে করে। অথচ অজ্ঞানের ভান করা ছাড়া আর কোনো অপরাধ নেই, মিথ্যাচার নেই। সে সেই ভিখারিনিকে স্বতঃপ্রাণোদিত হয়ে চুম্বনও করেনি। এটা সেই ভিখারিনির স্খলন। সেখানে তার কোনো হাত নেই। বলা যেতে পারে সে ভিখারিনির চুম্বনের শিকার হয়েছে।

তার দুর্বলতার একটাই জায়গা সে ভিখারিনির প্রেমে পড়েছে, রূপের প্রেমে। সে তাকে বিয়ে করতে চায় না। দেখা করতে চায়, কথা বলতে চায়। দেখা হলে কী কথা হবে যদিও জানে না সে। কিন্তু কখনোই তাকে বিয়ে করবে না। এই প্রেমখানিকে রক্ষা করতে চায় শুধু। ভালো লেগেছিল, ভালোবেসেছে। তার সাক্ষাতের জন্যই ঘুরে মরে, তার সাক্ষাৎ পায় না। যেন কোনো অলৌকিক যোগ আছে এই রমণীর সঙ্গে। একটি বার এক পলকের জন্য দেখছিল তাকে। তাতেই তাকে এত ভালো লাগা। তার প্রতি প্রেমবোধ। ফাহমিদা আর জাসমিন তাকে নিয়ে ভুল বুঝছে, বুঝুক। ভুল বোঝার মতো কারণ যথেষ্ট আছে। তাঁর ঠোঁটে সেই রমণীর ঠোঁটের রঙ নিয়ে বাড়ি এসেছিল নিজেরই অজান্তে।

রাতে খাওয়া দাওয়ার পর দুই বোনেতে পাশের ঘরে তাকে নিয়ে কী করবে, তা নিয়ে পরামর্শ করছিল। আর তখন সে ছিল সেই ভিখারিনির কথা নিয়ে। ভিখারিনি তার কাছে এসেছিল, কিন্তু দেখা হয়নি। বড়ো বেশি হতশ্বাস লাগছিল। ব্যর্থ হয়েছে সে। এই প্রেম শরীরে মনে লালন করে, অথচ প্রেমে কোনা সাফল্য পাচ্ছে না। তা না পেয়ে উপরন্তু বদনাম কুড়োচ্ছে। ফাহমিদা ও জাসমিনের কাছে সে দুশ্চরিত্র হয়ে উঠছে, তার সম্মানহানি হয়েছে, সে কদর্য লম্পট মানুষ হিসেবে বিবেচিত হয়েছে।

আজানের শব্দে ঘুম ভেঙে গেছে তার। বারান্দা জুড়ে আছে ভোরের বাতাস। বেশ ঠাণ্ডা বাতাস। ফাহমিদা তার মোটা শরীর নিয়ে পাশে শুয়ে আছে। আর বিকট স্বরে নাক ডাকছে।

মন ভালো নেই সাহিলের। মন ভালো নেই। ঘুম ভেঙে যাওয়ার পর নতুন করে ঘুমও আসছে না। আর নতুন করে ঘুমোবার আয়োজনেও অনিচ্ছা। স্বপ্নটা ভালো দেখেছে। ফকিরপাড়ার গৌরবের ইতিহাস ছিল তাতে।

বিছানা ছেড়ে বারান্দায় দাঁড়ায়। বাইরে বেশ অন্ধকার। এখনও ভোরের আলো ফুটতে দেরি আছে। পুব দিক এখনও আলোকিত হতে বেশ বাকি। রাতের গায়ে রাতের শব্দও সরে যায়নি, বেশ গাঢ় তার প্রলেপ। আকাশে তারা ঝিকিমিকি করছে।

পাশের ঘরের দরজায় খুট করে শব্দ হল। পাশ ফিরে দেখল জাসমিনকে বেরিয়ে আসতে।

জাসমিন পেছনে এসে দাঁড়াল। 'আপনি আমার ঘরের দরজায় টোকা দিয়েছিলেন একুট আগে?'

'না তো।'

'আমার যেন মনে হল।'

'তোমার মনের ভুল।'

'আপনি যে-সব ঘটনায় যান সে-সব তো মনে রাখতে পারেন না।'

'কে বলল?'

'আমি বলছি। মিথ্যাচারীও।'

'মানে?'

'আপনি কি সেই ভিখারিনির ঠিকানা দিতে পারেন?'

'না।'

'আপনি মিথ্যাচারী শুধু নন কপটও।'

'সে ভিখারিনির সঙ্গে সাক্ষাৎ তেমন করে হয়নি।'

'মিথ্যুক, ভণ্ড!'

'জাসমিন!'

'বিশ্বাস কর তার সঙ্গে আমার সঙ্গ নেই আসঙ্গও নেই।'

'মিথ্যাবাদী।'

'তাকে আমি খুঁজছি।'

'খোঁজার আর দরকার নেই।'

'আমি তার প্রেমে পড়েছি।'

'বলতে লজ্জা করছে না?'

'না।'

'আপনি আর কতদূর নামবেন? সর্বনাশ না ঘটিয়ে আপনি নারীলোভী মানুষ, আমাকেই বিয়ে করুন।'

'তোমাকে? বিয়ে?'

'ভিখারিনির চেয়ে অনেক যোগ্য আমি।'

'আমি তো ভিখারিনিকে বিয়ে করতে চাইনি। প্রেম।'

'আমার সঙ্গে প্রেম করুন।'

'তোমার প্রেমে পড়িনি তো আমি?'

'আমাকে প্রত্যাখ্যান করছেন?'

সাহিল নীরব থাকে।

'উত্তর দিচ্ছেন না কেন?'

'উত্তর আমার জানা নেই।'

২৫. ভিখিরির আবার কবে ঘাট পারানি লাগে!

বুড়ি নানি আসুরা ভিখারিনি রিজির উদ্দেশ্য বলল, 'তোকে ভালোবাসে এত বড়ো মানুষটা, অবার বলছি, লোকটার কাছে ধরা দে, তোর কপাল ফিরে যাবে।'

'আমি তো মাদারি ফকির বংশের কন্যা, আমি ভিক্ষাবৃত্তি ছাড়তে পারব না। আমার বংশের আর কেউ নেই যে ভিক্ষা করবে, জান থাকতে এত বছরের ইতিহাসটাকে আমি কিছুদূর রক্ষা করব। মারা যাওয়ার আগে পর্যন্ত।'

'কিন্তু বিয়ে করলে তোর ওলপোল হত। তাদের মধ্যে কেউ তো ভিখিরি হতে পারত।'

'কিছু ছেদ হবে যে, ইতিহাস সবসময় বয়ে যায়। আমি বিয়ে করলে ওই বড়ো মানুষটা কি ভিক্ষে করতে দেবে? কিন্তু লোকটা আমার ভিক্ষাবৃত্তির পেছন পেছন যায়, আমাকে খুঁজে বেড়ায়। ঘাটের কুমোর জ্যাঠা, সাজু মাঝি আর রাখাল মধু হালদারের কাছ থেকে জানতে পেরেছি লোকটা আমাকে ধরতে চায়। আমিও পালিয়ে বেড়াচ্ছি লোকটার হাতে ধরা না দিয়ে। আমার ভয়, ধরে ফেলে যদি!'

নানি বলল, 'কেন ঘাটের পথে তেমন সম্ভাবনা আছে নাকি? আমি তো জাদু জানি, ঘরের ভিতর তোকে লুকিয়ে রাখতে পারি। ব্যাটাচ্ছেলে তোকে খুঁজে পায় না।'

'আমার ঘরের চেয়ে বাইরে বেশি ভয়। বাইরে যদি বাগে পেয়ে যায়!'

'নিশ্চয় তোর পোশাকের বর্ণনা কেউ তার কানে পৌঁছেছে। তুই বরং এক কাজ কর, প্রতিদিন যে পোশাকে যাস তার বিপরীত কিছু পর। প্রতিদিন তো ওই উলিডুলি ছেঁড়া শাড়ি পরে যাস, এবার থেকে ভালো পোশাকে যা, তোকে চিনতে পারবে না। সে তো ভিখারিনিকে খুঁজবে। ভালো শাড়ি সায়া জামাতে কি কেউ ভিখারিনি থাকে।'

'বেশ, ভালো কথা বলেছ।'

'তাই পরিস।'

'কিন্তু একটা সমস্যা হবে যে কুমোর জ্যাঠা, সাজু মাঝি, মধু রাখাল ওরা যে আমায় চিনতে পারবে না।'

'চিনতে পারবে না তো কী হয়েছে, তোর চেনাচিনি নিয়ে দরকার কী শুনি। রাস্তার

মানুষ তো!'

'কুমোর জ্যাঠা, মাজু মাঝি না চিনলেই ভালো। উলিডুলি শাড়ির জন্য বড়ো অবজ্ঞা ব্যবহার করে। তাদের নাকে ঝামা ঘষে দেওয়া যাবে। কিন্তু মধু রাখাল সে তো আমার বন্ধু, তার সঙ্গে কথা না বললে যে আমার চলবে না। আমার যে দম বন্ধ হয়ে যাবে। সে তো চিনতেই পারবে না।'

নানি হাসল। অভিজ্ঞ সে। 'দুদিন অন্য মেয়ে সেজে মধু রাখালের সঙ্গে ভাব কর। দেখ, তোর সঙ্গে বন্ধুত্বটা তৈরি হতে পারে।'

'দেখি, কী হয়, তাছাড়া তো উপায় দেখছি না। সেজেগুজে ভালো শাড়ি পরতেই চাই, ভিক্ষাবৃত্তির জন্য ওই পোশাক পরি আমি। সবকিছুর পোশাক আছে। সাজতেই চাই আমি। সেজন্য রাতে সাজি।'

'কদিন ভালো পোশাকেই যা, ভালো মানুষটার চোখে ধুলো দিতে পারবি। তারপর কদিন নিরাশ হয়ে রণে ভঙ্গ দেবে ভালো মানুষটা, বড়ো মানুষটা।'

'কিন্তু ভালো পোশাকে ভিক্ষে পাব নানি?'

'তাইতো।'

'দেখো, কী ভুল কাজটা হবে।'

ঠোঁট কামড়ে নানি কয়েক মুহূর্ত ভাবল। তারপর মাথা নাড়াল কিছুক্ষণ। তারপর নিজেই হেসে উঠল। 'পেয়েছি। তুই ভিক্ষে করবি না, সাহায্য চাইলে পাবি। অনেক ভালো পোশাকে ভদ্দরলোকের মেয়েরা দোরে দোরে সাহায্য চেয়ে বেড়ায়। কেউ মেয়ের বিয়ে দিতে সাহায্য চায়, কেউ স্বামী-সন্তানের চিকিৎসার জন্য। সেটা ভিক্ষেই হল।'

'আমি কী বলব?'

'তোর স্বামীর অসুখ।'

'আমি তো নাকে পরিনি, লোকে যদি'---

'আমার পুরোনো নাকের একটা পরে নে।'

নানির সব উপদেশ পরামর্শ মেনে নিল রিজি। সে আজ থেকে কদিন ভালো পোশাকে ভিক্ষে করতে যাবে। যা সে কোনোদিন করেনি। লোকটার হাতে ধরা পড়বে না বলে তাকে এই পন্থা অবলম্বন করতে হচ্ছে।

পুবের আকাশ রাঙা হবার আগেই তাকে পৌঁছে যেতে হত পুবের দিকে খেয়া ঘাটে প্রতিদিন। পাখিরা তখন পুব থেকে পশ্চিমে আসে। তাদেরও বাসা ছেড়ে বেরিয়ে আসার কথা।

পোশাক পরতে সাজগোজ করতে রিজির আজ একটু সময়ও লাগল। বংশ পরম্পরায় পাওয়া হিরের টুকরোর একখানি সে অধিকারিণী হয়েছে। তাকে নানির হাত থেকে রক্ষা করার জন্য সে প্রতিদিন ভিক্ষাবস্ত্রের আঁচলে বেঁধে নিয়ে যেত, রাখালের গামছায় গচ্ছিত রেখে ভিক্ষা করে ফিরে আবার রাখালের কাছ থেকে

নিয়ে বাড়ি ফিরত। এই রত্ন সে রক্ষা করে চলেছে। তার কী হবে? হিরে নিয়ে ভিক্ষে করবে? তাহলে তো মধু হালদার জেনে যাবে তার আসল পরিচয়। মধুর থেকে বড়ো মানুষ জেনে গেলে ধরা পড়ে যাবে। তার চেয়ে হিরে নিয়ে ভিক্ষে করল না হয়। হিরে আঁচলে বেঁধে ভিক্ষে, কথাটা কেমন গালভরা। কিন্তু মধু রাখাল বালকের হাসি থেকে বঞ্চিত হবে, উষ্ণ করস্পর্শ থেকে বঞ্চিত হবে, এটা মেনে নেওয়া খুব কঠিন।

নানি বলল, 'আজ এত ভোর করে ফেললি?'

রিজি বলল, 'বড়ো মানুষের বিটিরা এত ভোরে ঘাট পেরোয় না। তাদের একটু সকাল হয়।'

হেসে ফেলে নানি।

রিজি বলল, 'কেমন দেখাচ্ছে?'

'একদম বড়ো মানুষের বিটি।'

রিজি জোরে হেসে ওঠে।

'তোকে আমারই অচেনা লাগছে।'

'সত্যি বলছ নানি?'

'একদম।'

'কিছু খুচরো পয়সা দাও?'

'কেন?'

'ঘাট পারানি লাগবে।'

'ভিখিরির আবার কবে ঘাট পারানি লাগে!'

'আজ যে আমাকে ভিখিরি লাগবে না।'

'ও হ্যাঁ, আমারই ভুল হয়েছে।' আঁচল খুলে কিছু খুচরো পয়সা দেয় রিজিকে নানি।

রিজি ভাবে সাজু মাঝি খুব অবজ্ঞা অবহেলা দেখাত, আজ নাকের ডগায় পয়সা ফেলে নদী পার হবে।

২৬. খুব নোংরা পোশাক, আমি তো দোরে উঠতেই দিই না।

ঘাটের গায়ে কুমোর বাড়িতে পৌঁছল যখন রিজি পুবের আলো ফুটে গেছে। তখনও সাজু মাঝি ঘাটে আসেনি। সাজু মাঝির অপেক্ষায় এখন থাকতে হবে। ওপারে যাবে, ওপারে দূরের গ্রাম, যেখানে সে ভিক্ষাবৃত্তি করে। তো এখন সাজু মাঝির অপেক্ষা করতে কুমোর জ্যাঠার কুমোরশালে বসতে হবে। দেখল বড়মানুষটা তার আগেই ওত পেতে বসে আছে। তাকে দেখে চিনতে পারল না। তার মানে আজ উলিঝুলি পোশাকে এলে নিশ্চিত হাতে নাতে ধরা পড়ত।

কুমোর জ্যাঠা বলল, 'তা মা দিদিমণি বাইরে দাঁড়িয়ে কেন, ভেতরে টুলে বসুন না মা।'

অন্যদিন কুমোর জ্যাটা কুমোরশালে উঠতেই দেয় না। আজ খাতির দেখে মনে মনে হাসে রিজি। উঠে যায় কুমোরশালে, টুলে বসে। পাশটিতে অন্য টুলে বসেছে বড়ো মানুষটা, বেশ দেখতে।

কুমোর জ্যাঠা চাকে হাঁড়ি তৈরি করতে করতে তাকাল সাহিলের দিকে, 'বাবু, আজ এখনও এসে পৌঁছল না ভিখিরি মেয়েটা। ভাগ্য ভালো থাকলে এসে যাবে। কিন্তু এত তো দেরি করে না। আপনি তো আজ আগেভাগে এসেছেন।'

'সেদিন তো দেরি করে আসার জন্য পাইনি।'

'আপনার কোনো কিছু খোয়া গেছে কি?'

রিজি বুঝতে পারল তার সম্পর্কে কথা বলছে ওরা। কুমোর জ্যাঠা তাকে চিনতে পারেনি, বড়ো মানুষটিও নয়।

বড়ো মানুষটাকে নীরব দেখে কুমোর জ্যাঠা আবার শুধোলে, 'ভিখারি মেয়েটা আপনার কিছু হাতিয়ে নিয়ে গেছে নাকি?'

বড়ো মানুষটা বলল, 'হ্যাঁ।'

'সেটা খুব কি মূল্যবান?'

'হ্যাঁ।'

'নিশ্চয় সোনাদানা কিছু।'

বড়ো মানুষটা আর কিছু বলল না।

রিজির জানতে খুব ইচ্ছে হল ভিখারিনিটার কাছে কী খুইয়েছে এই বড়ো মানুষটা।

'আপনি খুঁজছেন সে টের পেয়েছে বলেই গা ঢাকা দিয়েছে, আসছে না।'

'এ ঘাটেই তো পেরোয়?'

'হ্যাঁ, এ ঘাটেই, খুব নোংরা পোশাক, আমি তো দোরে উঠতেই দিই না। সাজু মাঝি লগিপেটা করে এই মারে তো, এই মারে।'

বড়ো মানুষটা উসখুস করে উঠল। 'আমি তার খারাপ স্বভাবের কোনো সন্ধান পাইনি।'

'ওই যে বললেন মূল্যবান জিনিস হাতিয়ে নিয়েছে?'

'তা তো বলিনি। খোয়া গেছে বলেছি—সে যে হাতিয়েছে এ কথা কখন বললাম?'

'খোয়া যদি না যায় তাকে ধরবেন কেন, তার কী দোষ?'

'কুমোর জ্যাঠা ঠিক কথা বলেছেন কিন্তু আপনি।' আলোচনায় যোগ দেয় রিজি।

রিজির সমর্থন পেয়ে কুমোর জ্যাঠা আরও প্রশ্নমুখর হয়ে উঠল, 'খোয়া যাওয়ার সঙ্গে তার কী সম্পর্ক?'

বড়ো মানুষটা ঢোক গিলল। 'যাক, কুমোব জ্যাঠা এ নিয়ে আমি আপনার সঙ্গে তর্কবিতর্ক করব না। আমার কী খোয়া গেছে আমি জানি।'

রিজি এবার বড়ো মানুষটাকে সরাসরি প্রশ্ন করল, 'ভিখারিনির পেছনে ধাওয়া করছেন, অথচ কী খোয়া গেছে না জানলে বিচার পাবেন কী করে?'

'সে তার কাছ থেকেই বুঝে নেব।'

রিজি বলল, 'মন চুরি গেছে বুঝি?'

কুমোর জ্যাঠা হো হো হেসে উঠল। 'ভারী মজার কথা বললেন মা দিদিমণি, গায়ের গন্ধে ভূত ভেগে যাবে, বাবুর নাকি মন চুরি করেছে।'

'সত্যি সত্যি মন চুরি করছে কুমোর জ্যাঠা', সাহিল বলল। কথাটা যেন শুনতে পায়নি কুমোর জ্যাঠা এমন না শোনার ভঙ্গি করে সে।

এই বড়ো মানুষটার মন চুরি হয় কীভাবে ভিখারিনির কাছে? সে পেছনে ফিরে দেখে সাজু মাঝি এসেছে কিনা। কথাটাকে এড়াতে চায়, গিলতে পারছে না—বড়ো মানুষটা বেমালুম বলে দিল! সাজু মাঝি এসেছে। 'ওই তো সাজু মাঝি লগি হাতে এসে গেছে।'

রিজি পাড়িতে যাওয়ার জন্য উঠে পড়ল।

লোকটাও উঠল আর পিছু পিছু আসতে লাগল।

ঘাটে এসে সাহিল নৌকায় আগে ওঠার চেষ্টা করছিল, তাকে ধমকায় সাজু মাঝি। 'আগে দিদিকে উঠতে দিন।' রিজির দিকে যত্নে লগি বাড়িয়ে দেয়। এমন যত্ন করে কোনোদিন নৌকায় তোলে না সাজু মাঝি তাকে। সাজু মাঝি তাকে চিনতে পারেনি। তার খাতির কী! মাঝখানে দাঁড়াতে দিয়েছে।

বড়ো মানুষটা সাজু মাঝিকে শুধোলো, 'আরও ভোরে পাড়ি দাওনি তো?'

'ও আপনি! তো সেই নোংরা ভিখিরিটার খোঁজে আজও নাকি?'

'তারই খোঁজে বটে, কিন্তু তাকে নোংরা বলতে আমি রাজি নই।'

'তাহলে আপনি তাকে দেখেননি।'

'দেখেছি বললে ভুল বলা হবে। কিন্তু সে খুব সুন্দর।'

সাজু হেসে ওঠে। 'কি বলছেন বাবু! আপনার মাথা কি খারাপ হয়েছে!'

'আমি তার রূপেই মজে আছি।'

'ওই ভিখারিনির রূপ, হাসালেন বাবু।'

কথাবার্তা শুনে হাসি পায় রিজির। দেখতে পায় ওপারের ঘাটে বন্ধু মধু দাঁড়িয়ে আছে। মধু তাকে চিনতে পারবে না বলে তার খুব দুঃখ হয়।

ওপারে নৌকা ঠেকায়। প্রথমেই তাকে নামায় লগি ধরে। আজ আর কুমোর জ্যাঠা আর সাজু মাঝি কেউই দূরছাই করেনি। সেই ব্যবহারের মধ্যে তো এক ধরনের ভালোবাসা ছিল, তা আজ পায়নি বলে আর মধু রাখাল তাকে চিনতে পারবে না বলে চোখে তার অশ্রু ছেয়ে আসে।

বড়ো মানুষটা মধুর সঙ্গে কথা বলছে।

রিজি পাড়ে নেমে শাড়ির আঁচল ঠিক করার ভান করে বিলম্ব করে। বাবুকে রাখাল খবর দিতে পারেনি আজ সেই ভিখারিনির।

২৭. সব নারীই পুরুষদের প্রসব করেছে।

রিজি খানিকটা পথ উজিয়ে এসেছিল, বড়ো মানুষটা বড়ো পায়ে হাঁটতে হাঁটতে তাকে ধরে ফেলে।

বড়ো মানুষটা তাকে শুধোলো, 'আপনি কোথায় যাবেন বোন?'

'আমি আলতা গ্রামে যাব।'

'আলতা নামে কোনা গ্রাম আছে নাকি?'

'আপনি জানেন না?'

'না।'

'আপনি কোথায় যাবেন?'

'কোনো একটা গ্রামে, আলতা গ্রামে যেতে পারি আপনার সঙ্গে। এদিকটা তো চিনি না, যে-কোনো একটা গ্রামে সন্ধান করলেই হল, অন্য পথে যদি গিয়ে থাকে।'

'ও, সেই ভিখারিনির সন্ধান করবেন? যে আপনার মন চুরি করেছে?'

'আপনি কী করে জানলেন? ও তখন তো বলেছি কুমোরশালে।'

'কিন্তু কুমোর জ্যাঠা শোনেননি, বিশ্বাস করেন না বলে। আমি বিশ্বাস করেছি, তাই শুনতে পেয়েছি। অনেক কথা শুনেও না শোনার ভান করলে দায়িত্ব এড়ানো যায়।'

'আপনি বিশ্বাস করেছেন শুনে আমার ভালো লাগল।'

'কিন্তু আপনি তো তাকে দেখেননি, আপনার মন নিয়ে গেল কী করে?'

'আমার সঙ্গে তার দেখা অলৌকিকতায়।'

'সে কি আপনাকে ভালোবাসে?'

'জানি না। না ভালোবাসলে মরে যাব।'

'আপনি তার জন্য কী করতে পারেন?'

'মরতে শুধু পারব না, এক লরি টাকা চাইলে দিতে পারব।'

'আপনার বুঝি অনেক টাকা!'

'আল্লা দিয়েছে।'

'তা সত্ত্বেও ভিখিরিকে পাওয়া সহজ হচ্ছে না কেন?'

'তাই তো, ভেবে পাই না। আমি খুব দুঃখী হয়েছি।'

'আর তারও খুব কষ্ট হচ্ছে, লুকিয়ে লুকিয়ে বেড়াতে হচ্ছে, প্রকাশ্যতার ভিতর আড়াল আছে হয়তো।'

'তেমনটাই আমার মনে হয়, আপনি জানলেন কী করে?'

'আমিও তো মেয়েমানুষ কিনা!'

'ও হ্যাঁ। কিন্তু প্রকাশ্যতার মধে আড়াল কথাটির মধ্যে রাষ্ট্রনীতি পররাষ্ট্রনীতি ঢুকে যেতে পারে।'

'আমি এত বুঝি না, মেয়েমানুষ কিনা!'

'আমি বিশ্বাস করি না। আপনি একথার জন্ম দিয়েছেন, আপনি এ কথার বিস্তার জানেন।'

'সব নারীই পুরুষদের প্রসব করেছে।'

'আর এক কথার জন্ম দিলেন। বেশ। আপনি কি জ্যোতিষ জানেন?'

'তাও জানি।'

'বলুন তো গত রাতে আমি কেমন ছিলাম?'

'আপনার ঠোঁটে সমস্যা ছিল।'

'কী দারুণ বললেন। একদম অব্যর্থ। আপনি সত্যিই জ্যোতিষ জানেন? আচ্ছা তাহলে বলুন তো ভিখারিনি কেন আমাকে প্রত্যাখ্যান করে?'

'তার একটা হিরে আছে, সেই হিরের লোভটা কোনোদিন প্রধান হয়ে উঠলে যদি সেই ভিখারিনি অপ্রধান হয়ে যায়, সেই ভয়ে আপনাকে সে প্রত্যাখ্যান করে।'

'সে তো ভিখারিনি, তার কাছে হিরে আসবে কোথা থেকে?'

'ভিখারিনির কাছে হিরে থাকতে পারে না?'

'না।'

'যদি আপনি প্রমাণ পান তাহলে আপনি কী কসম খাবেন?'

'তাহলে আমি ফকিরপাড়া ছেড়ে দেব, দ্বিতীয় বিয়ে করব।'

'তাহলে তো ভোগে যাবেন আপনি।'

'আমার প্রেম থাকবে না, আমার শাস্তি সেখানেই। ভিখারিনির প্রেম আমি ত্যাগ করব।'

'ভোগের মধ্যে এ কেমন ত্যাগ!'

'আমি আপনাকে বোঝাতে পারব না। সে রূপসী বলে আমাকে টেনেছে, তার চেয়ে বেশি ভিখারিনি বলে। তার যদি হিরে থাকে, আর হিরে হাতানোর লোভ যদি আমার মধ্যে গড়ে ওঠে—যদিও তার হিরে থাকাটা আমি বিশ্বাস করি না, সেহেতু এই প্রেম আমাদের মধ্যে একদিন গড়ে উঠবেই। প্রেম ছাড়া তার কাছ থেকে কোনোদিন কোনো কিছু চাইব না। এমনকি তাকে তো আমি বিয়ে করব না। দেহাতীত হবে এই প্রেম। তার কাছ থেকে কিছু চাইছি না যখন হিরেও চাইছি না, আর ফকিরপাড়া ছাড়ছি না, দ্বিতীয় বিয়ে করছি না।'

'কিন্তু আমি ভবিষ্যদ্বাণী করছি, আপনি তার কাছ থেকে হিরে চাইবেন, আর তার প্রেম থেকে প্রত্যাখ্যাত হবেন।'

'তাহলে আমি ফকিরপাড়া ছাড়ব, দ্বিতীয় বিয়ে করব।' হো হো করে হেসে ওঠে সাহিল। তুড়ি মেরে উড়িয়ে দেয় এই ভবিষ্যৎবাণীকে। অল্পবয়সী মেয়েটি তাকে কী বলছে! সব গাঁজাখুরি।

রিজি পাশ ফিরে অগ্নিবর্ষী দৃষ্টিতে তাকাল। 'হাসছেন যে?'

'হাসার কথা বললে হাসব না?'

'আপনি তার কাছ থেকে কোনোদিন হিরে চাওয়ার লোভ সংবরণ করতে পারবেন তো?'

'আমার কীসের অভাব, তার হিরেতে লোভ করব। প্রথমত আমি বিশ্বাস করি না ভিখারিনির কাছে হিরে আছে।'

'এতখানি দম্ভ করা ভালো নয় কিন্তু।'

'আমার চারখানা লরি, বাস, টাটাসুমো, মারুতি, জমিজমা, ফ্ল্যাটবাড়ি, আমার তো অভাব কিছু নেই?'

'ভিখারিনি তো সাধে ভিক্ষে করে না, বংশের ভিক্ষাদর্শন রক্ষার্থে, ইতিহাস রক্ষার্থে।'

'আপনি কী করে জানলেন?'

'আমি জ্যোতিষ গণনায় জেনেছি।'

'আমার অত কিছু জানার দরকার নেই।'

'তাদের ছিল ঘোড়া। তারা রাখত বহু মূল্যবান রত্ন, করত ভিক্ষা, ভিক্ষাদর্শন পৌঁছতে, কেউ যদি কিছু তাঁদের কাছ থেকে চাইত তাহলে তারা মূল্যবান রত্ন নির্দ্বিধায় দিয়ে দিত।'

'আমি বিশ্বাস করি না।'

'বেশ। এর বেশি কথা নেই আপনার সঙ্গে। চলুন আলতা গ্রামে একসঙ্গে যাওয়া যাক।'

মনে মনে খুব খুশি হল রিজি। লোকটার দম্ভ দেখেছে। প্রেম আছে কিন্তু প্রেমের মধ্যে নিবেদনের কোনো দীনতা নেই, বিনয় নেই। ভিক্ষাবৃত্তির মধ্যে যা থাকে।

২৮. বিয়ে না করেও নারীরা গর্ভবতী হতে পারে।

অনেক হাঁটতে হাঁটতে অবশেষে তারা আলতা গ্রামে পৌঁছল। ততক্ষণে বেলা বেড়েছে। মূল রাস্তার ধারে একটা মুদি দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে পড়ল রিজি। বলল, 'এবার আমি প্রতিটি বাড়ির দোরে দোরে যাব। আপনি?'

'আমি গ্রামের প্রবেশ পথের ধারে থাকব, তাকে খুঁজব। সে এই গ্রামে আসতেও পারে।' তারপর সাহিল পকেট থেকে মোবাইলটা বের করল, দেখল, বলল 'এখানেও নেটওয়ার্ক নেই, আসার পথ জুড়েও নেটওয়ার্ক ছিল না, এই পথ আর গ্রামটা ম্যাপে আছে তো?'

রিজি দাঁড়িয়ে পড়েছিল। লোকটার কথা শুনে হাসল। কোনো মন্তব্য করল না। একটু দাঁড়াল লোকটার সঙ্গে। একসঙ্গে এতটা পথ এসেছে, ছেড়ে যাওয়ার সৌজন্য থাকা উচিত।

রিজি বলল, 'আপনি থাকুন তাহলে, ভিখারিনির সন্ধানে থাকুন। আমি বিদায় জানাব আপনাকে।'

'আপনি কি এখানেই আজ থেকে যাবেন?'

'না ফিরে যাব বিকেলবেলা।'

'ওই পথে?'

'ওই পথে।'

'তাহলে তো একসঙ্গে ফেরা যেতে পারে।'

'ততক্ষণে আপনি পথপানে চেয়ে থাকুন, খুঁজে বেড়ান আপনার ভিখারিনিকে।'

'আপনার এগ্রামে কাজ কী?'

'দোরে দোরে যাওয়া।'

'সার্ভের কাজ?'

'হ্যাঁ।'

'কী ধরনের?'

'আমি এখানে প্রতিটি বাড়ির মেয়েদের মুঠির উদারতা একভাবে সমীক্ষা করব, অন্যভাবে তাদের সচ্ছলতা, দারিদ্র বুঝে নেব। তাছাড়া দুঃখ সম্ভোগের আঁচও বুঝে নিয়ে আসতে পারব। আমি খুব সামান্য নারী, আমার চাহিদাও খুব কম। আমি ভিখিরির সগোত্র।'

'আপনি সামান্য নারী হতে যাবেন কোন্ দুঃখে? আপনাকে দেখে তো মনে হয় সম্ভ্রান্ত ঘরের মেয়ে। আপনার বিয়ে হয়নি?'

'আমার বিয়ে করার পরিস্থিতি তৈরি নেই দেশে।'

'দেশে?'

'হ্যাঁ দেশে। দেশে গণতন্ত্র নেই।'

'আপনি কি কোনো রাজনীতির'—

'রাজনীতি আমাকে নিয়ে।'

'এই গ্রামে আপনার কি কোনো রিস্তেদার আছে?'

'মা বাবা ভাই বোন মেয়ে জামাই নাতি নাতনি আছে।'

'এই যে বললেন বিয়ে হয়নি?'

'বিয়ে না করেও নারীরা গর্ভবতী হতে পারে।'

'হেঁয়ালি করছেন?'

'এসব কথা শোনার আপনার শিক্ষা নেই।'

'কী বললেন?'

'কিছু বলিনি, বুঝতে চেয়েছি।'

'আবার দেখা হবে?'

'ফেরার সময় পর্যন্ত অপেক্ষায় থাকতে পারলে আজকেই আবার দেখা হবে।'

'আমি আপনার সঙ্গেই ফিরব। ফেরার পথ খুব একটা চিনি না।'

'এখানেই থাকবেন তো?'

'হ্যাঁ এই দোকানের কিছু একটা কিনে খেয়ে থাকব। সামনে টিউবওয়েল আছে।'

'আপনার পথভ্রষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা বেশি।'

'কী বললেন?'

'এবারও কিছু বলিনি। বলছিলাম এই পথের বাঁকেই থাকবেন। অন্য কোনো মোহ আপনাকে পথভ্রষ্ট না করে।'

'না, না, আমি এখানেই থাকব।'

'কথা দিলেন?'

'কথা দিলাম।'

নারীটি চলে গেল গ্রামের ভিতর পাড়ায় পাড়ায়। আশ্চর্য এক রমণী। ওর সঙ্গেই ফেরা যাবে। কিন্তু পথ চেয়ে বসে থাকবে সে সেই ভিখারিনির উদ্দেশ্যে। এই পথেই যদি ভিক্ষে করতে আসে, তার সঙ্গে সাক্ষাৎ ঘটবে। অন্য গ্রামে যদি যায়, দেখা হবে না। সে জানে, তাকে এভাবে চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। নিরাশ হলে হবে না, ভেঙে পড়লে চলবে না। নারীর প্রেম সহজ ব্যাপার নয়। তাকে খুঁজে যেতে হবে। তার জন্য অপেক্ষা করে যেতে হবে। ব্যাবসা দেখছে ম্যানেজার নিশার। তার ওপর ভরসা করা যায়। সে ব্যাবসা থেকে ছুটি নিল না হয়। আলতা গ্রামটা খুবই সাধারণ। খুবই দরিদ্র লোকজনের বাস। ভিক্ষার জন্য যদি ভিখারিনি এ গ্রামটাকে বেছে নেয়, তা অনুচিত হয় তার পক্ষে। ভিক্ষে তো সচ্ছল ব্যক্তিরাই দিতে পারে। কিন্তু দরিদ্র মানুষ দরিদ্র মানুষের কাছেই সহায়তা চায়। এমনই স্বভাব মানুষের। নিশ্চিত করে বলা যেতে পারে, এইসব গ্রামে ভিক্ষে করতে আসার সম্ভাবনা ভিখারিনির ক্ষেত্রে বেশি। এখানে পথপ্রান্তে বসে থাকতে হবে তার অপেক্ষায়। দেখা হলে কী বলবে, কী কথা হবে তার সঙ্গে?

সময় কাটাবার জন্য মোবাইলে গেম খেলতে লাগল সে। মুদি দোকানের সিমেন্টের বেঞ্চে বসেছে। খুব শান্ত, নির্জন গ্রাম। বিকেল পর্যন্ত এখানেই কাটাতে হবে, পথের দিকে চেয়ে বসে। এখানে ফিরে আসবে সেই নারীটি, তার সঙ্গে ফিরবে, খেয়াঘাটের পথে। এতক্ষণ মোবাইলে গেম খেলল না-হয়। মাঝে মাঝে পথের দিকে দৃষ্টি দিলেই হল।

মুদি দোকানদার বলল, 'কাদের বাড়ি যাবেন?'

'কারও বাড়ি যাব না, আমি এখানে অপেক্ষায় থাকব।'

'কী কাজ?'

'কোনো কাজ নেই। অপেক্ষা করছি একটি নারীর জন্য। আপনার এখানে থাকলে'—

'না-না, থাকুন না। তবে আপনাকে এখানে একা একা থাকতে হবে।'

'কেন, আপনি কি এখনই দোকান বন্ধ করবেন?'

'কেনাবেচা কম। তাছাড়া'—

'তাছাড়া কী?'

'কাল রাতে খুব উল্কাপাত হয়েছিল। উল্কার একটা টুকরো গতরাতে হাসমত চাচার বাকুলে পড়েছিল। জনে জনে সবাই দেখতে যাচ্ছে সেই আশ্চর্য উল্কার টুকরোটা। আমারই যাওয়া হয়নি। ভাবছি দোকান বন্ধ করে এবার যাব। অনেকে বলছে অনেক দামী বস্তু পেয়েছে হাসমত চাচা। হাসমত চাচা বিক্রি করে দিতে চায়।'

'বিক্রি করে দেবে? কত টাকায়?'

'এখনও দাম বলেনি। তবে বেশি খাঁই নেই।'

'কততে দেবে মনে হয়?'

'যতদূর জানি বিশ পঁচিশ টাকা এই মুহূর্তে দরকার হাসমত চাচার। কোদাল কাস্তে পাঁজাবার জন্য লাগবে। আর হাটে গিয়ে কার্তিকের কিছু বেগুনচারা কেনার প্রয়োজন। ওই এলোকেশী বেগুনের চাষ দেবে।'

'আমিই কিনব উল্কার টুকরোটা।'

'তাহলে আমার সঙ্গে চলুন।'

'সে তো যাবই।' বিশ পঁচিশ টাকায় উল্কার টুকরো পেয়ে যাবে, কল্পনাই করতে পারেনি সাহিল। এখানে এসেও ব্যাবসা বুদ্ধি কাজে লাগছে।

সে ব্যবসায়ী মানুষ, যাচা লক্ষ্মী পায়ে ঠেলবে না। অতঃপর সে মুদি দোকানদারের সঙ্গে হাতমত চাচার বাড়ি যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হল।

২৯. দাঁড়ান, আপনাকে আমি উদ্ধার করে আনছি।

অতঃপর দোকানের সামনে গ্রামের প্রবেশ পথে পৌঁছতে সাহিলের গোধূলিবেলা হয়ে গেল। এতক্ষণ এক ঘোরের মধ্যে ছিল সে। মনে ছিল না বিকেলে সেই নারীটির অপেক্ষায় থাকার কথা। নিশ্চয় সেই নারীটি তার দেখা না পেয়ে ফিরে গেছেন ঘাটের পথে। একটু পরেই সন্ধ্যা নামবে, কীভাবে বাড়ি ফিরবে সে একা একা? সে তো পথ চেনে না। সে তো এ পথে অনভ্যস্ত।

গোলমালটা উল্কার টুকেরা সংগ্রহ করার জন্য হয়ে গেল। ভুলেই গিয়েছিল যে এক ভিখারিনির সন্ধানে এসেছিল। ভিখারিনির দেখা পাওয়ার বাসনা থেকে, উদ্যোগ থেকে সে বিচ্যুত হয়েছে। আর সেই নারীটি যিনি তাকে পথ চিনিয়ে আলতা গ্রামে এনেছিলেন, তাঁর সঙ্গে অঙ্গীকারেও অসফল। নারীটি তেমন ইঙ্গিত করেছিলেন তার ব্যাপারে। একটু শ্লেষও ঝরে পড়েছিল। তিনি নিশ্চিত অন্তর্যামী নারী। জ্যোতিষও জানেন। অনেক ভবিতব্যও বলে দিতে পারছিলেন। কিন্তু ভিখারিনির হিরেতে লোভ হবে এ গল্পটা ধাপ্পা। ভিখারিনির আবার হিরে থাকে নাকি?

তবে তাঁকে মনে হয়েছিল আশ্চর্য এক নারী। তিনি ছাড়া পথ চিনে বাড়ি ফেরা তার পক্ষে দুরূহ।

কুড়ি টাকার বিনিময়ে হাসমত চাচার কাছ থেকে উল্কার টুকরোটা সংগ্রহ করেছে। নিশ্চিত কোনো মিউজিয়াম এই উল্কার টুকরোটা প্রচুর অর্থ দিয়ে কিনে নেবে। এটা

তার একটা সম্পদ। সে এখানে এসেও নাফা করছে। হাসমত চাচা ডাল ভাত খাওয়াল। আর উত্তরপাড়া থেকে ফিরতে ফিরতে গোধূলিবেলা নেমে এল। একটু পরেই সন্ধ্যা নামবে। পথ চেনা অসুবিধে হবে। দোকানের রাস্তার বাঁক থেকে পথ চলতে লাগল সাহিল। সামনেই একটা বড়ো রাস্তা পড়বে, যেখানে বাস চলে, যেটা পেরিয়ে এসেছিল।

বেশ কিছুক্ষণ পথ হাঁটার পর বড় রাস্তায় পৌছতেই সন্ধ্যা নেমে এল। মোবাইল বের করে দেখল কোনো নেটওয়ার্ক নেই। তাছাড়া রাস্তায় লোডশেডিঙের জন্য দোকানগুলো অন্ধকার। চারপাশে ঘুটঘুটে অন্ধকার। এলাকাটার ভূগোল ইতিহাস কিছুই জানে না সে। কীভাবে সে বাড়ি পৌঁছবে জানে না। ঘাটের পথটাও খুঁজে পাচ্ছে না। এবার মনে এল নারীটির সঙ্গ হারানো তার পক্ষে সুখকর হয়নি। মোবাইলের টাওয়ার থাকলে না হয় ম্যানেজার নিশারকে ডেকে নেওয়া যেত।

রাস্তার ধারে একটা চা দোকানে দুটি মাঝবয়সী লোক বসেছিল। দোকানের ভিতর লম্ফের আলোয় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে চা করছিল দোকানদার।

লোক দুটিকে সাহিল শুধোলো, 'এখানে কোনো টেলিফোন বুথ নেই?'

রোগামতো লোকটা বলল, 'সামনের মোড়ে।'

'কথটা পথ?''

বেঁটে লোকটা বলল, 'পাঁচ মিনিট হাঁটা।'

অতঃপরে হাঁটতে শুরু করল সে। হাঁটছে তো হাঁটছে। পাঁচ মিনিটেরও বেশি পথ হেঁটে ফেলেছে। টেলিফোনের বুথের দেখা নেই। আরও কিছুটা হাঁটার পর মোড়টা এল। এখানে পৌঁছতে লোডশেডিং ঘুচল। আলো ঝলমল করে উঠেছে মোড়। একজন পান দোকানদারকে শুধোলো টেলিফোন বুথটা কোথায়? দোকানদার দেখিয়ে দিল চারটে দোকান পর। গিয়ে দেখল টেলিফোন বুথ বন্ধ। পাশের দোকানকে শুধিয়ে জানতে পারল টেলিফোন বুথের মালিকের আজ মেয়ের বিয়ে,তাই বন্ধ। এখানে আর কি টেলিফোন বুথ নেই? একজন বলল এখানে নেই। আরও একটা মোড়ে গেলে বুথ পাওয়া যাবে। অন্য মোড়টা এখান থেকে পাঁচ মিনিট হাঁটা পথ। অগত্যা আবার হাঁটতে শুরু করে দিল সে। সত্যি সত্যি বিপদাপন্ন হয়েছে, এখান থেকে কীভাবে বাড়ি ফিরবে জানে না। এ জায়গাটার কী নাম তা তো জানা হয়নি। একজনকে শুধিয়ে জানা গেল গাজিপুর। দশ মিনিট পথ হেঁটেছে, এখনও মোড়টা এল না। তখনি তার মোবাইল বেজে উঠল।

'হ্যালো।'

'আপনি কোথায়?'

'কে বলছ তুমি?'

'আমি জাসমিন।'

'আমি এখন হারিয়ে গেছি, বলতে পারছি না কোথায় আছি।'

'সে কী কথা!'

'পরে ফোন করে তোমাকে জানাচ্ছি।'

'আপনি ভালে আছেন তো?'

'ভেবে বলতে হবে।' নিজে ফোনটা কেটে দেয় সাহিল। তারপর রাস্তায় অন্ধকারে দাঁড়িয়ে নিশারকে ফোন করে। নিশারের মোবাইল বেজে যায়, নিশার ধরে না। দু-বার বেজে শেষ হয়। আবার ধরে। চারবারের মাথায় নিশার ধরল। 'কী হল এত দেরি হল?'

'মোবাইল টেবিলে রেখে বাথরুমে গিয়েছিলাম।'

বাপ্‌রে আমি যে এখানে ফেঁসে গেছি। বাড়ি ফিরতে পারছি না। কোথায় এসে পড়েছি, গাজিপুর।'

'বাস বা অটো ধরে সোজা বাগনানে চলে আসুন না।'

'তুই নিয়ে যা মোটর সাইকেল এনে। আমি বাসের ভিড়ে যেতে পারব না।'

'আপনি ওদিকে কেন গিয়েছিলেন?'

'উল্কার টুকরো সংগ্রহ করতে। অনেক নাফা হবে।'

'পেয়েছেন?'

'পেয়েছি।'

'দাঁড়ান, আপনাকে আমি উদ্ধার করে আনছি।'

'দেরি করবি?'

'না না।'

'আমার যে এখানে দম বন্ধ হয়ে আসছে।'

'আমি জানি আপনি কোনো ব্যবসায়ী ফন্দিতে এঁটে আছেন। না হলে ভোরের বেলা বাড়ি থেকে বেরিয়ে উধাও!'

'তবে দেরি করবি না।'

'এই এক্ষুনি যাচ্ছি।'

সাহিল ভাবল, ভিখারিনির খোঁজে বেরোনোর কথাটা ম্যানেজারের কাছে একদম চেপে যাবে।

৩০. ভিখিরির পোশাকে সে আরও সম্পন্ন ও সম্ভ্রান্ত ছিল।

রিজি জানত রাস্তার মোড়ে মুদি দোকানের সামনে বড়ো মানুষটা থাকতে পারবে না। তার প্রতিশ্রুতির দৌড় সে চেনে। ভোগী মানুষ, তার মতো তো দীন দুঃখী ভিখারিনি নয়। অনেক প্রলোভন তাকে টলাতে পারে। ভিখিরির লোভ নেই, পছন্দ অপছন্দও নেই। সে যা বলে তাই করে। সে তো ঠিক সময়ে সেই জায়গায় গিয়েছিল, কিন্তু মানুষটা ছিল না। তার পক্ষে দেরি করা সম্ভব হবে না। কেন না দেরি করলে ঘাটে পৌঁছতে সন্ধ্যা হয়ে যাবে। আজ অন্ধকার রাত আছে। ঘাটে মধুর মুখ দেখতে পাবে না দেরি করে গেলে। মধু তাকে চিনতে না পারলেও মধুকে না দেখে যেতে

পারবে না। মধুকে এতই তার ভালো লাগে। দু-চারদিন ভালো পোশাক পরে বড়ো মানুষটার চোখে ধুলো দিতে পারলে, দু-চারদিন পর আগের পোশাকে ঘাট পেরোলে মধু আবার তাকে চিনতে পারবে। তখন না হয় মধুর হাত ধরবে চিবুক নেড়ে আদর করে দেবে। আর তার কাছে হিরেটা গচ্ছিত রাখতে পারবে। ফেরার পথে হিরেটা ফিরিয়ে নেবে।

ভালো পোশাকে একদিনেই হাঁপিয়ে উঠেছে রিজি। ভালো শাড়ি সায়া জামা গায়ে ফুঁটছে। ওই ন্যাতা ময়লা ছেঁড়া শাড়ি সায়া জামাই ভাল। তাছাড়া ভিক্ষে করতে গিয়ে ভাল পোশাক মানায় না। ভিক্ষাবৃত্তির বিশ্বস্ততাও হারিয়ে যায়। লোকে টেরিয়ে দেখছিল। কেউ কেউ ভিক্ষে দিতে কুণ্ঠা জানায়। কোনো পুরুষমানুষ লোভের চোখে তাকায়। সাধ করে কী ভালো পোশাক পরেছিল, বড়ো মানুষটা যে পিছু নেয়। আর লোকটার নাকে ঝামা ঘষে দিয়েছে বেশ করে। পাশে পাশে হাঁটল, কথা বলল, সওয়াল জবাবে গেল কিন্তু চিনতে পারল না।

রিজি ভেবে পায় না রিজির রূপ যদি লোকটাকে মুগ্ধ করে, সে কোন্ রিজির রূপ? যে গায়ের পাশে থাকা সত্ত্বেও তারিফ নেই? মিথ্যে মিথ্যে, মিথ্যে এই প্রেমে পড়া। লোকটাকে প্রত্যাখ্যান প্রথম থেকে যে করে আসছে, ভালো করেছে। গ্রহণের কোনো যুক্তি ও আবেগ খুঁজে পায় না রিজি। লোকটা তার পিছু ছাড়ে না কেন? জীবনের ছন্দটা হারিয়ে যাচ্ছে। সে অথচ কোনোদিন বিয়ে করবে না, ভিক্ষাবৃত্তি করে যাবে। লোকটার খায়েশ পূরণ হবে না কোনোদিন।

তার মতো ভিখারিনির প্রেমে পড়েছে একজন কোটিপতি, এই গল্পটা কম আকর্ষক নয়। এই ভাবনার ভিতর থাকতে রিজির ভালো লাগে। গল্পটা নাড়াচাড়া করতে ভালো লাগে। নাড়াচাড়া করে। ব্যক্তি নিরপেক্ষভাবে গল্পটাকে নাড়াচাড়া করে, তখন আরও ভালো লাগে। একজন ভিখারিনির প্রেমে পড়েছে এক কোটিপতি। সেই নারীকে পাওয়ার জন্য ছুটে বেড়াচ্ছে গ্রাম-গ্রামান্তর। নাওয়া নেই খাওয়া নেই। চুলে তেল নেই, গা খড়ি। চোখের নীচে কালি। দিনে দিনে কোটিপতি পথশ্রমে ক্লান্ত-দুর্বল হয়ে উঠেছে। কোটিপতির এই দুর্দশা চোখে দেখা যাচ্ছে না। রোগা হয়েছে গায়ের রং পুড়ে কালো হয়েছে।

আর সেই ভিখারিনি কিছুতেই আত্মসমর্পণ করবে না। আত্মগোপন করছে নানা জায়গায়। প্রাণ নিয়ে যেন ছুটে বেড়াচ্ছে, শিকারীর লক্ষ্য থেকে যেভাবে কবুতর লুকিয়ে পড়ে। ধরা দিলেই তার যেন মৃত্যু। কোটিপতি তার পাণিগ্রহণ করলে যেন কোনো অভিশাপ ফলবে। কোনো কিছু পাথর হয়ে যাবে কিংবা কোটিপতির মৃত্যু ঘনিয়ে আসবে।

মধু বলল, 'আপনি তো ওপারে যাবেন—ওই সাজু মাঝি নৌকা নিয়ে আসছে।'

আহা মধু তাকে চিনতে পারল না। বুক ফেটে যায় রিজির। 'তুমি কারও জন্যে ঘাটে অপেক্ষা করে আছ?'

'হ্যাঁ, আমার দিদি যদি ওপারে যায়! আপনার কণ্ঠস্বর আমার দিদির মতো।'

'আহা বাছা, তোমার দিদি বুঝি এল না! আরও অপেক্ষা করবে?'

'হ্যাঁ, আরও একটু অপেক্ষা করব।'

'আর অপেক্ষা করো না, সন্ধ্যা নেমেছে। বাড়ি ফিরে যাও।'

'দিদির সঙ্গে দেখা হল না, আজ রাতে ঘুমই আসবে না।'

'সে কি তোমার নিজের দিদি?'

'নিজের দিদির বাড়া।'

'আহা বাছা, যাও বাড়ি ফিরে যাও।'

'আপনি যদি আমার দিদি হতেন! এই সময়েই ফেরে!'

'দিদি ভেবে নিয়েই বাড়ি ফিরে যাও না।'

'আপনাকে আমার ভালো লাগল। কথায় মায়া আছে।' ফিরে যায় মধু।

এই অপরিচয়ের জন্য বুক ফেটে যায় রিজির। মধুর অবস্থা দেখে তার কষ্ট হল। কিছু করার নেই তার, কিচ্ছু করার নেই। পাশ ফিরে দেখল সাজু মাঝি ঘাটে নৌকা ভিড়িয়েছে।

'উঠে আসুন গো দিদিমণি, লগি বাড়িয়ে ধরেছি।'

রিজি উঠে যায় নৌকায়।

সাজু মাঝি বলল, 'সকাল থেকে মনটা খারাপ।'

'কেন সংসারে অশান্তি হয়েছে? ও একটু আধটু অশান্তি হয়েই থাকে। তার জন্য মন খারাপ করে থাকতে নেই।'

'না, সংসারে অশান্তি হয়নি।'

'তবে?'

'এক ভিখারিনি আমার নৌকোতে প্রতিদিন বিনা পারানিতে পারাপার হয়, আজ তার সাক্ষাৎ পাইনি।'

'সে তো ভিখারিনি, রূপসী সুন্দরী নয়, তার জন্য কেন?'

'তাকে খুব দূরছাই করি, সে না এলে আবার খারাপ লাগে।'

'ও তাই? তাকে কি আপনি ভালোবাসেন?'

'তা তো জানি না। মনকে তো এতদিন শুধোইনি। ভালো কথা মনে করিয়ে দিয়েছেন, আজ রাতে ঘুমোবার আগে সে কথা ভাবব।'

সাজুর এই উক্তিতে রিজির কণ্ঠ রোধ হয়ে আসে। আর কথা বলতে পারে না। সাজু মাঝি প্রতিদিন তাকে কত হেনস্তা অবজ্ঞা করে, তার মনে যে রিজির প্রবেশ এমন গাঢ় রকম আছে, এ ছদ্মবেশে না এলে বুঝতেই পারত না। আহা, কত ভালোবাসে এই রাগী মানুষটা। এরা কেউ কোটিপতি নয়। সাধারণ অতি সাধারণ, দিন আনে দিন খায়। দারিদ্র্যে, কষ্টে বাঁচে।

অবরুদ্ধ কণ্ঠে ঘাটে নেমে অন্ধকারে সেঁদিয়ে যায় রিজি। সে যদি সাজু মাঝির

সঙ্গে আর একটা কথা বলত, তাহলে কেঁদে ফেলত। নিজেকে রক্ষা করতেই অন্ধকারে সেঁদিয়ে পড়েছে। সামনে কুমোর জ্যাঠার কুমোরশাল পড়বে। পাশ দিয়ে যায়।

'কে রে, রিজি গেলি নাকি?'

রিজি কোনো কথা বলে না। পাশ দিয়ে চলে যায় কণ্ঠস্বর দিয়ে তাকে যদি চিনত, সে তো তার চেহারা দেখাতে পারছে না—অন্ধকার কি না! এরা সবাই তাকে অবহেলা করলেও মনের গভীরে ভালোবাসা জমিয়ে রেখেছে তার জন্য। সেই কোটিপতি তাকে এই পোশাক কেন পরতে বাধ্য করাল? ভিখিরির পোশাকে সে আরও সম্পন্ন ও সম্ভ্রান্ত ছিল।

৩১. ভিখারিনির সাক্ষাৎ পেলেন?

রাত্রি আটটার মধ্যে আজ বাড়ি ফেরা গেল। নিশার তাকে গাজিপুর থেকে সটান বাড়িতে এনে তুলে দিয়ে যায়। সারাদিন বাড়ির মেয়েরা অস্থির হয়েছে, নিশারকেও ফোনে অস্থির করেছে। বলেছে বাড়ির সবাই অসুস্থ হয়ে পড়েছে। বিশেষ করে মেয়ে আনিসার অসুস্থতার কথা জানিয়েছে। সাহিল এক কাপড়ে ভোরে সেই বেরিয়ে গিয়েছিল। বাড়িতে এসে বুঝতে পারল থমথমে অবস্থা। ফাহমিদা ও জাসমিন বিছানায় শুয়ে আছে। যে যার ঘরে।

কাজের মেয়ে নসিবা খালা তাকে লুঙি গামছা দেয়। পানি দেয়।

তারপর সে সটান বাথরুমে ঢুকে যায়। গোসল করবে সে। বাড়ির মেয়েদের এই গোঁসা করা তার না পছন্দ। মেজাজটা এমনিতেই বিগড়ে আছে। নিজের স্বাধীনতা ভোগ করবে না? ওরা চায়, এদের সব সময় তাঁবে থাকে। জিন্দেগিতে তা পারবে না। তার যা মন চাইবে, তাই করবে। এইসব ফোঁসফোঁসানি নাকে কান্না পছন্দ নয়। না পোষালে বাপের বাড়ি চলে যাক। নাকে দড়ি দিয়ে ঘোরানোর বান্দা এ মিয়া নয়। মেয়েছেলের কথায় ওঠ বোস করে না সে। মেয়েছেলে এগারো হাত কাপড়েও ল্যাংটো। তাদের আবার রোয়াব কী! যা বলব তাই শুনবে। সে তো আর রসাতলে যায়নি, হীন কাজ কিছু করেনি। এমন অসামাজিক কাজ এ মিয়া কোনোদিন করবে না। হক হালাল খেতেই পছন্দ করে।

সারাদিনের ধকলটা তাকে আরও বিগড়ে দিয়েছে। বাড়িতে ফিরে ফাহমিদা ও জাসমিনের শুয়ে থাকা দেখে জান জ্বলে উঠেছে।

গোসল সেরে বাথরুম থেকে বেরিয়ে আসতে দেখল ফাহমিদা বিছানা ছেড়ে উঠেছে। খাবার ঘরে কী খুটখাট করছে।

জাসমিন বারান্দার এক কোণে দাঁড়িয়ে অন্ধকার আকাশের দিকে তাকিয়ে আছে।

পোশাক বদলে বারান্দার চেয়ারে একপাশে বসল সাহিল।

মেয়ে আনিসা ছুটে এল, 'আব্বু, আব্বু!' তার গা ঘেঁষে দাঁড়ায়। 'আব্বু, আমার কিছু অঙ্ক একটু কঠিন লাগে, তুমি বুঝিয়ে দিলে আমার সহজ মনে হবে।'

'কতগুলো অঙ্ক?'

'বেশি নয়, দু-একটা।'

'কেন মাস্টার বোঝায় না?'

'তোমার মতো বোঝাতে পারে না।'

'আজ মাস্টার আসেনি?'

'মা আসতে বারণ করেছে।'

'কেন?'

'তোমার ওপর রাগ দেখাতে।' ফিস ফিস করে বলে আনিসা। সাহিল বলল, 'ঠিক আছে তোমাকে অঙ্কগুলো আমি নিজে বুঝিয়ে দেব।'

আনিসা তফাতে সরে দাঁড়ায়, কিন্তু ফিরে যায় না।

ছেলে ফরিদ সামনে এসে দাঁড়াল। 'আব্বু, আজ স্কুলে যেতে দেয়নি।'

'কেন?'

'তুমি নাকি কোথায় চলে গেছ!'

'এসব বদ কথা তোমাদের শেখাচ্ছে বুঝি!'

'দুপুরে রান্নাই হচ্ছিল না।'

'এতদূর! কচি বাচ্চাদের ওপর অত্যাচার! দাঁড়াও মজা দেখাচ্ছি!'

জাসমিন দূর থেকে চাপাস্বরে বলে, 'এই যাবি তোরা! তোদের পড়াশোনা নেই!'

আনিসা ও ফরিদ ধমক খেয়ে চলে গেল।

ফাহমিদা এক গ্লাস সরবত নিয়ে এসে সামনে ধরল।

ডান হাত দিয়ে গ্লাসের অবস্থান থেকে হাতটা ঠেলে সরিয়ে দিল সাহিল। কোনো কথা বলল না। কথা বলার প্রবৃত্তি সে হারিয়ে ফেলেছে।

পাশে ফাহমিদা সরবতের গেলাস নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। মুখে আঁচল চেপে কাঁদছে।

পাশ ফিরে জাসমিন চাপা কণ্ঠে বলল, 'আপনি কি মানুষ! আপনাব জন্য বুবু সারাদিন কিছু খায়নি জানেন।'

'আমি খেতে বারণ করিনি।'

'বেশ সরবতটা খেয়ে নিন, আপনার সব কথা শোনা হবে।' কাছে এসে দাঁড়িয়েছে জাসমিন।

বাধ্য হয়ে হাত বাড়িয়ে সরবতটা নেয়। তারপর খায়।

জাসমিন বলল, 'ভিখারিনির সাক্ষাৎ পেলেন?'

'নাহ্।'

'ভুলে যান ভিখারিনির কথা।'

'তুমি অত শাসনের স্বরে বলছ যে?'

'আপনার প্রতি জোর ফলাবার আমাদের সম্পর্ক আছে!'

'অবার দ্বিবচনের ইঙ্গিত আনছ?'

'এটা গৌরবার্থে দ্বিবচন, বহুবচনও বলতে পারেন।'

'তুমি কেউ নও, ফাহমিদা আমার বিবি।'

'বেশ। আমি তার বোন।'

'ফাহমিদার প্রতি আমি কোনোদিন কোনো অন্যায় করতে পারব না। প্রতিজ্ঞা আছে আমার।'

'সেটা কী প্রতিজ্ঞা?'

'আমি দ্বিতীয় বিয়ে করব না।'

'প্রেম করলে অন্যায় হয় না?'

'প্রেম একটা অদ্ভুত জিনিস, তাকে বাস্তবতায় আনা কঠিন। বাস্তবিক আমি কোনো অন্যায় করব না। বিবির স্ত্রীত্বকে একমাত্র ও প্রধান করব।'

'দাম্পত্য কি প্রেমহীন?'

'এত প্রশ্ন কোরো না।'

'বলুন, উত্তর দিন।'

'আমি মনীষী নই, দার্শনিক নই।'

'আজ আপনাকে ক্লান্ত দেখাচ্ছে। বেশি প্রশ্ন করব না। বরং চলুন আমরা আজ তাড়াতাড়ি খেয়ে নিই।'

জাসমিন আর ফাহমিদা চলে যায় খাবার ঘরে। সাহিল অত কিছু ভাবছে না, খাবারের জন্য অপেক্ষা করতে থাকল। অতকিছু ভাববে কেন?

৩২. রাতের অন্ধকারের গায়ে তারা যেন আলপানা হয়ে ওঠে।

অতঃপর রাতের বেলা কিছুতেই ঘুম আসছিল না সাহিলের। ফাহমিদা ও জাসমিন খাওয়া দাওয়ার পর যে-যার ঘরে শুতে গেল। সাহিল বসেছিল বারান্দা অন্ধকার করে।

কিছুক্ষণ পরেই জাসমিন বেরিয়ে এল বারান্দায়, ক্রিমের গন্ধ নিয়ে এল। ক্রিমের গন্ধটা ভাল। পারফিউম নয়। বলল, 'ঘুম ধরছে না।' পাশের চেয়ারটাতে এসে বসল। গলাখাঁকারি দিল। বোধ হয় মৌবি মুখের ভেতর চিবোচ্ছিল। বেশ কিছুক্ষণ এসে বসেছে, কোনো কথা বলছে না। এই না কথা বলার আরাম উপভোগ করল সাহিল। রাত ক্রমশ বাড়ছে। ছেলে মেয়েরা ঘুমিয়ে পড়েছে।

অনেকক্ষণ পরে জাসমিন বলে উঠল, 'আচ্ছা জামাইবাবু, আপনার বিয়ের দিনটার কথা মনে পড়ে?'

'মনে করলেই পড়ে।'

'আপনাকে কিন্তু বরপোশাকে ভালোই মানিয়েছিল। আর আমি তখন'—

'আরে তুমি তো তখন কত ছোটো। বছব আট বয়স হবে। বোধহয় ক্লাস ওয়ানে পড়তে।'

'না টুয়ে।'

'ওই হল। এতটুকুটি। সে-সব ছবি অ্যালবামে। তোমাকে আজকের দেখে কে

বলবে সেদিনের জাসমিন। তবে নাকের মিল পাওয়া যাবে। কি কচি কচি মুখ ছিল। আঠারো বছর আগের কথা। আমি তখন বেশ রোগা ছিলাম। তোমার দিদিও রোগা ছিল। বেশ দিন গেছে, একদিন তো বেড়াতে গেলে আমার সঙ্গে কলকাতায়।'

'আপনি চুল টানতেন, কান টানতেন।'

'অঙ্ক ঠিকমতো পারতে না যে!'

কিছুক্ষণ পরে সাহিল বলল 'তুমি তোমার বুবুর সঙ্গে বিয়ের দিন এসেছিলে। রাতে আমাদের বিছানায় শুয়ে ঘুমিয়ে পড়লে।'

'আপনার মনে আছে?'

ফাহমিদা বারান্দার দরজার সামনে দাঁড়িয়ে এতক্ষণ শুনছিল, ওদের গল্প খানিকটা শুনে নিশ্চিন্তে চলে গেল শুতে।

'আপনি তখন যেমন দেখতে ছিলেন, বেশি কিছু পরিবর্তন হয়নি আপনার। বয়সের চেয়ে কম বয়স মনে হয় আপনাকে।'

'তাই? ভালো কথা বলেছ তো। আমার সহপাঠীদের সত্যি বুড়ো দেখায়।'

'আপনি সফল মানুষ'।

'কী ভেবে বললে?'

'এই যে এত বড়ো কারবার উন্নতি।'

'জান, এক সময় আমরা খেতে পেতাম না। আব্বার কারবার তেমন চলছিল না। আমি তো সবকিছু করি। আব্বা মা তাড়াতাড়ি মারা গেল। এত সুখ দেখে যেতে পারল না। আমি শুধু ভাবি আমার সৌভাগ্যের কথা, যাতে হাত দিয়েছি সোনা ফলেছে। আমি কোনোদিন আশাহত হইনি।'

'আপনাকে খুব পরিশ্রম করতে হয়েছে বলুন।'

'খাওয়ার সময় পেতাম না। আমার শুধু মনে হয় মানুষ চেষ্টা করলে সব পারে।'

'সবাই পারে না, আপনার মতো মানুষই পারে। কী আছে আপনার মধ্যে?'

'জানি না। বোধহয় আমি খুব পরিশ্রমী।'

'পরিশ্রমী, তো একজন মজুরও।'

'আমার বুদ্ধি অনেকটা কাজ দিয়েছে।'

'ছোটোবেলায় আমাকে আপনার মনে পড়ে?'

'তোমাকে তো কোলে পিঠে করেছি, খুব আদরের ছিলে। তখন তোমার দাঁত ভাঙছিল। একটা দাঁত নড়ছিল দেখাতে এলে, আমি দেখতে গিয়ে ভেঙে দিলাম। কী খুশি হলে তুমি। পুকুরের মাঝখানে ফেলে দিলে ছুঁড়ে।'

'আবার সে-সব দিন যদি ফিরে আসত, তাহলে আপনার আদর পেতাম।'

'তুমি আদরের ছোটো শালি, এখনও তো ভালোবাসি।'

'ভালোবাসেন?'

'ও মা বুঝতে পার না।'

'আপনার মতো পুরুষমানুষই আমার পছন্দ।'

'বেশ কদিন হল তুমি এসেছে, আরও বেশ কিছুদিন তুমি থাকবে, আমি খুশি। বাড়ি ফেরার সময় মনে পড়ে তুমি আছ। আমার মাঝে মাঝে শখ যায় তোমার সঙ্গে দুষ্টুমি করি।'

'করলেই পারেন। আপনাকে আমি পছন্দ করি।'

'তুমি কী সুন্দর দেখতে!'

'সত্যি?'

'সত্যিই তো। ঠিক তোমার বড়োবুবু বিয়ের সময় যেমন দেখতে ছিল।' কথা নীরব হয়ে পড়ে।

জাসমিনও আর কথা বলতে পারে না। জাসমিন হাত বাড়িয়ে দেয় সাহিলের হাতের মধ্যে। নীরবতার ভিতর হাতের ভাষায় তারা থাকে। সাহিলের ভালো লাগে জাসমিনের হাত নিয়ে খেলা করতে। রাতের অন্ধকারের গায়ে তারা যেন আলপনা হয়ে ওঠে। সাহিল ভাবল, এও এক ধরনের প্রেম। এই প্রেম সে গ্রহণ করেছে।

কিছুক্ষণ পর জাসমিন নীরবে হাত ছাড়িয়ে নিজের ঘরে চলে যায়।

সাহিল চুপ করে খানিকক্ষণ বসে থাকে বারান্দায়। ফাহমিদার নাক ডাকার শব্দ শুনতে পায়। ফাহমিদার কম বয়সের ভূত তাকে আক্রান্ত করেছে। ক্ষত বিক্ষত হতে থাকে বারান্দায় একা বসে বসে। জাসমিন তার ঘরে বিছানায় চলে গিয়ে অনুগমনের ভাষা দিয়ে গেছে। আর সে এখন বারান্দায় বসে যন্ত্রণায় ছটফট করে। সারা শরীর জুড়ে বিক্ষোভ, হুল্লোড়, সমস্ত মন জুড়ে বিক্ষুব্ধ আলোড়ন। সে দাম্পত্য-আসক্তিতেই থাকতে চায়। ফাহমিদার যুবতী বয়সের রূপের আকর্ষণে সে আক্রান্ত হয়েছিল। জাসমিন আর কেউ নয় ফাহমিদারই যুবতী বয়স।

জাসমিনের প্রতি ভালোলাগা প্রেমবোধ তৈরি হল, ওইটুকু সম্পদই রক্ষা করুক সে। সে কিছুতেই অধিকার করতে পারে না জাসমিনের শরীর। পাপ হবে, অসততা। নিজের লোভ সংবরণ করতে থাকে।

জাসমিনকে ভালোলাগাটা জাসমিনও বুঝেছে। ব্যবহার দিয়ে কথা দিয়ে অকপট স্বীকারোক্তিতে গেছে সে। এখন যেন জাসমিনের সঙ্গে বাদ-প্রতিবাদের সম্পর্কটা ফুরিয়ে যেতে বসেছে। তার হাতের স্পর্শের ভিতর বুঝেছে, নারীত্বের নাজুক স্পন্দন তার মধ্যে ধরা দিয়েছিল। বড়বুবুর জন্য অনেক কটু কথা বলেছে সে, আর বোধহয় বলতে পারবে না। সাহিল কীভাবে যেন ভালোলাগাটা প্রকাশ করে ফেলল, কীভাবে যেন অনুভব করল, জানে না। নিশ্চিত তার মধ্যে জাসমিনের প্রতি ভালোবাসা সংগ্রহ ছিল। আজ এই মুহূর্তে প্রকাশ হয়ে পড়ল।

৩৩. তার পদক্ষেপ ঝরনার মতো মৃদুভাষ।

রিজি ভিক্ষে থেকে নানির ঝুপড়ি ঘরে ফিরে নাকে কাঁদতে লাগল। 'নানি, আমি এই বাহারি শাড়ি পরে আর ভিক্ষে করতে যেতে পারব না।'

'বড়ো মানুষটার হাতে ধরা দিতে চাস?'

রিজি টান মেরে শাড়ি খুলে ফেলে। 'না, কভি নেহি।'

'তবে কেন পরবি না?'

'আমার কষ্ট হয়। আমার অনভ্যাস এই পোশাক। তাছাড়া লোকে ভিক্ষে দিতে চায় না।'

'আর কী কী অসুবিধে?'

'কুমোর জ্যাঠা চিনতে পারে না। সাজু মাঝি চিনতে পারে না। মধু রাখালকে ঠকাচ্ছি আমি। তাছাড়া হিরে'—

'হিরে?'

ঠোঁট কাটে রিজি। 'না, হিরে দাদা একজন আছে।'

' তোর খায়েশ কী?'

'মানুষ অবজ্ঞার ভিতর যে ভালোবাসা দেয় সেই ধরন আমার পছন্দ।'

'প্রতিদিন তোর সঙ্গে যায় কী বড়ো মানুষটা?'

'প্রথম দিন সেই গিয়েছিল, আর এই চারদিন হল টিকিটি দেখা যায়নি। শুধু শুধু ভালো শাড়ি পরে যাওয়া আসা।'

' তোর কি মন কেমন করছে, তোর সঙ্গে যাচ্ছে না বলে?'

'ঝাঁটা মারি!'

'চারদিন যখন যায়নি, তখন চারে অন্য মাছ তুলেছে।'

'বলছ?'

'বলছি তো। কাল থেকে পুরোনো শাড়িতে বেরবি।'

রিজির মুখে হাসি ফুটে ওঠে। বুড়ি নানিকে জড়িয়ে ধরে চুমু খায়। 'বিপদে পড়ব না তো?'

'একদম হক কথা বলছি।'

'নানি তুমি কত জান, সত্যি নানি তোমার তারিফ করি।'

বাইরে এসে চোখে মুখে জল দেয় রিজি। ঘরে ফিরে গিয়ে আবার আশঙ্কিত হয়ে ওঠে তার মুখ। 'নানি, রাতেরবেলা আবার আসবে না তো মানুষটা?'

'আর আসবে না।'

'কেন? কী করে বলছ?'

'কে যেচে ব্যর্থতা বাড়াতে চায়? কতবার এসেছে। তুই ছিলি, অথচ তোকে পায়নি।'

'তুমি জাদু জান।'

'আমার কাছে হেরে গেছে।'

'আমার কাছেও হারবে?'

'তোর কাছে?'

'হ্যাঁ আমার কাছে। ওকে ফকিরপাড়া ছাড়তে হবে, দ্বিতীয় বিয়ে করতে হবে।'

'ব্যাপারটা'—

'এ ওর নিয়তি। বড়ো বেশি দম্ভ।'

'ইস, তুই অত খেপে গেছিস যে!'

'আমি অন্য রমণীর বেশে ওর সঙ্গে কথা বলেছি। ভিখারিনির হয়ে আমি ওকে চ্যালেঞ্জ জানিয়েছি। আমার কাছে নাকি কোনো কিছু ভিক্ষে করবে না। আমার কাছে যদি হিরে থাকে, ও তাতে লোভ করবে না।'

'সত্যি তোর কাছে কোনো হিরে আছে রিজি?'

'কথার কথা বললাম।'

'ও তাই।'

খেতে খেতেই কথা বলে। কথা বলতেই বলতে খায়। ছোটো আলোটা জ্বলতে থাকে ঘরের এক কোণায়। এমনিতে ছোটো ঘর, আলোটা অনেক ছোটো। কিন্তু ছায়া অনেক বড়ো। ঘরের চেয়ে ছায়া বড়ো।

নানি বলল, 'তুই অত রেগে আছিস কেন?'

'মধুকে পাইনি অনেকদিন। রেচারা রাখালটা দিদি দিদি করে হুতোশলাগা হয়ে যাচ্ছে।'

'বেশ কাল থেকে যাবি।'

'তোমার সাহসেই সাহস।'

এবার তারা পাশাপাশি শুয়ে পড়ল এক বিছানায়। কিছুক্ষণ পরে রিজি বলল। 'নানি জান, কুমোর জ্যাঠা, সাজু মাঝি সত্যিই আমাকে ভালোবাসে।'

'তবে যে বলতিস দূরছাই করে?'

'ভুল। ভুল বলতাম। অন্য নারীর বেশে গিয়ে বুঝেছি।'

'তাহলে তো এই পোশাক তোর কাজে দিয়েছে।'

'হ্যাঁ, সেই আনন্দে তো ঘুমোতে পারছি না।'

নানি কপালে হাত বুলিয়ে দেয় রিজির। রিজি ভিখারিনি স্পর্শের আনন্দে ধীরে ধীরে ঘুমিয়ে পড়তে থাকে। ঘুম। সম্পূর্ণ ঘুমিয়ে যায়। আর স্বপ্ন দেখতে থাকে। আশ্চর্য ঘোড়ার শব্দ। তার গায়ে বাহারি রঙের মখমলের ঝালর। তার লাগাম ধরে হাঁটতে হাঁটতে কোনো ফকির চলেছে রাস্তা ধরে। ফকিরের গলায় বহু মণি মুক্তো হিরে জহরত খচিত হার। ফকির যেতেযেতে ভিক্ষেব গান গেয়ে চলেছে। আকাশ ঝলমল রোদ্দুরের

ভিতর তার যাত্রা। রাস্তার দুপাশের মানুষ সালাম জানাচ্ছে। তার ঝোলায় ভিক্ষে ভরে দিচ্ছে। অপূর্ব তার ভঙ্গি। পুরুষটি খুব সুদর্শন। তার হাসিটি আরও সুন্দর। সে শিশুদের মাথায় হাত বুলিয়ে দোওয়া করছে। তার চোখের চাহনি সুমিষ্ট। তার হাতের স্পর্শ মধুর। তার পদক্ষেপ ঝরনার মতো মৃদুভাষ। তার দেহ সঞ্চালন খেতের ফসলের মতো হিল্লোল তোলে।

ইতিহাসের পদসঞ্চার হয় রিজির স্বপ্নের ভিতর। আকাঙ্ক্ষার মিলন হয়। রিজি ভিখারিনি নন্দিত গ্রামগুলোতে বিহার করে যেন। আগে থাকে ফকির। এই ফকির কোনোদিন যুদ্ধক্ষেত্রে যাবে, পিছু পিছু যাবে ফকিরিনিও।

বাতাস জোরে বয়। প্রথমে ধুলোর ঝড় ওঠে। তারপর গাছপালার শাখাপ্রশাখা আন্দোলিত হয়। তাকে এগিয়ে যেতে হবে। একটু একুট করে সে এগোয়। দু-হাত দিয়ে ঝড় সামলায়। বড়ো দুর্যোগগ্রস্ত লাগে তাকে।

এক সময় ঝড় থেমে যায়। পশ্চিমে সূর্য তখন অস্ত যাবে। আকাশ পরিষ্কার হয়ে গেছে। সূর্যটা শান্ত নিটোল রঙে নেমে আসতে চাইছে নীচে। ফকির আল্লার দরবারে দু-হাত তুলে দোওয়া মাঙছে। আল্লার শোকর গুজার করছে। খুবই শান্ত সেই ফকির।

৩৪. খুব মন কেমন করছে আপনার জন্য।

আজ সকাল থেকেই সাহিল তার বাগনানের অফিসে এসেছে। মনটা চঞ্চলই, শান্ত রাখার চেষ্টা করেছে। এমনিতেই সে শান্ত স্বভাবের মানুষ আর বুদ্ধিমান বলে সকলে জানে। যেদিন থেকে সেই ভিখারিনির প্রেমে পড়েছে, সেদিন থেকে ভেতরে ভেতরে সে অশান্ত হয়েছে। আজও সেই ভিখারিনির দেখা পায়নি। এখনও সে আশা ত্যাগ করেছে, এমন নয়। তাকে চেষ্টা চালিয়ে যেতেই হবে, অভিযান চালিয়ে যেতেই হবে।

দুপুর একটায় মোবাইলে জাসমিনের এস এম এস এল, 'মনটা ভালো নেই, আপনার কথা ভাবছি, আপনার?' উত্তর দেয়নি, পড়ে নিয়েছে শুধু। জাসমিনে সে যথেষ্ট দুর্বলও হয়। কিন্তু উৎসাহ খুঁজে পায় না। সমস্ত আকাঙ্ক্ষা ভিখারিনিকে ঘিরে। তার কাছে তো জাসমিন কত নাগালের মধ্যে। অথচ যাকে খুঁজে খুঁজে হয়রান হচ্ছে, তার প্রতিই বেশি লোভ। জাসমিন কী তাকে আক্রান্ত করে না? করে। জাসমিনের মেসেজের উত্তর একটা দিতে পারত। দেয়নি। জাসমিনের এস এম এস যে তার ভলো লাগেনি, তা নয়। যথেষ্ট চনমনে করে তোলে মনটাকে।

কিছু কিছু সিদ্ধান্ত ম্যানেজার নিশার ভুল ভাল নিয়েছিল, বকুনি দিয়ে শুধরে দেয়। ফ্ল্যাট বুক করতে একজন খদ্দের এসেছিল অ্যাডভান্স করে গেল। যে ফ্ল্যাট সব বুকিং হয়ে গেছে তা নয়, গোটা তিনেক এখনও পড়ে আছে। ২০ অক্টোবর ফ্ল্যাট উদ্‌বোধন হবে। দ্রুতগতিতে ফ্ল্যাটের কাজ চলছে। জানালা দরজা মোজায়েকের কাজ, রঙের কাজ চলছে। আর ন দিন বাকি। তার মধ্যে কাজ শেষ করবে। ফ্ল্যাটের মালিকরা ঢুকে যেতে পারবে।

নীচের দোকানগুলোও সেরে ফেলতে হবে। দোকানের মালিকরা কেউ না কেউ কোনো কারণে ফোন করেই চলেছে। তাগাদা দিচ্ছে।

ফ্ল্যাট বাড়িটা ঘিরে এত ব্যস্ততা যে সাহিল একা মনে ভিখারিনির কথা ভাবার সময় পাচ্ছে না। ফ্লাটের মালিকরা ফোন করে জানাচ্ছে এটা হয়নি কেন, এরকম চেয়েছিলাম অন্যরকম হয়েছে। নানারকম বায়নাক্কা করছে। তাদের সামাল দিতে জেরবার হচ্ছে সাহিল। নানারকম প্রতিশ্রুতিও দিচ্ছে। কিছু শুকনো প্রতিশ্রুতিও দিচ্ছে। ব্যাবসায় এ ধরনের মিথ্যাচার থাকে,থাকবেই। ধোয়া তুলসীপাতা হলে ব্যাবসা চলে না। মনে মনে জেদ পুষতে হবে। মিথে মিথ্যে রাগ দেখাতে হবে। কখনো কখনো রাগ সামলে খামোশ খেতে হবে। শত্রুর সঙ্গে বন্ধুর মতো ব্যবহার করতে হবে। সুনাম গড়ার জন্য যেচে কাউকে আপ্যায়ন করতে হবে। ব্যাবসা কি এত সহজ নাকি? ব্যবসায় উন্নতি করা আরও কঠিন। দাঁতে দাঁত দিয়ে পড়ে থাকতে হয়।

একটার পর নিশারকে নিয়ে একবার ফ্ল্যাট ঘুরে এল সাহিল। প্যারিসের কন্ট্রাকটরের সঙ্গে বচসাও করল। রাগারাগি করল। এদের চাপ না দিলে ঢিল দেবে। কাজ খারাপ করে দেবে। পার্টি অসন্তুষ্ট হবে। কোনো কোনো ফ্লাট মালিকের সঙ্গে মন্ত্রী-আমলাদের দহরম মহরম। তাদের সামলাতে হবে ঠিকঠাক। বিগড়ে দিলে চলবে না। সাপও না মরে, লাঠিও না ভাঙে। আড়াইটার সময় জাসমিনের এস এম এস এল, 'এত কি কাজ? ভুলে থাকেন?' মুচকি একটা হাসি এসেছিল সাহিলের মুখে। এত ব্যস্ততার মধ্যে ভালোই লাগল জাসমিনের এই মেসেজ। নিজে কোনো উত্তর লিখবে না। না।

বোধহয় নিশার তার মুচকি হাসিটা দেখেছে। মালিক কী ভেবে হেসে উঠেছে। মালিক রসে বশে আছে, মনে করছে। এত সমস্যা এত ব্যস্ততার ভিতর হাসিটুকু মহার্ঘ্য মালিকের। এস এম এসেই হেসেছে। কী এস এম এস এসেছে? কার পাঠানো কোনো মহার্ঘ্য বার্তা?

নিশার শুধু তার হাসিটুক দেখে খুশি থেকেছে। উদ্‌বোধনের অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট ব্যক্তিদের নিমন্ত্রণের তালিকা করতে দিয়েছে নিশারকে, এম পি, এম এল এ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি, বিডিও, আই সি, সাংবাদিক, আকাশবাণী ও দূরদর্শনের সাংবাদিক, প্রাইভেট টি ভি চ্যানেলের সাংবাদিক কেউ বাদ না যায়। সবাইয়ের জন্য একটা বিরিয়ানির প্যাকেট করতে হবে। ফুলের মালা, মাইকে ভাষণেরও ব্যবস্থা থাকবে। সাহিল সেদিন কী পোশাক পরবে, আগে থেকে ঠিক করে রাখবে। কী বলবে, আগে থেকে ঠিক করতে হবে।

এই প্রথম ফ্ল্যাট বাড়ি বানিয়েছে সে, সুনাম অর্জন করতে হবে। কেন না আরও ফ্ল্যাটবাড়ি বানাতে চায়। ভালোই লাভ এতে। একটু ধুমধাম করেই উদ্‌বোধন করবে। তাতে প্রচারও হবে। ফ্ল্যাটবাড়ির নাম দিয়েছে 'শবনম অ্যাপার্টমেন্ট'। শবনম তার মায়ের নাম। হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে শবনম শব্দে কারও আপত্তি নেই। এটা একেবারে একটা অসাম্প্রদায়িক শব্দ। শবনম মানে শিশির।

আবার এস এম করল জাসমিন। 'খুব মন কেমন করছে আপনার জন্যে।' এত ব্যস্ততার মধ্যে এত সমস্যা-যন্ত্রণার মধ্যে জাসমিনের এস এম এস কিন্তু সাহিলের মনে আনন্দ তৈরি করছে। এখানকার ব্যস্ততা সরিয়ে সে কথা ভাবছেও। জাসমিনের সঙ্গে কি তার সত্যি সত্যি প্রেম তৈরি হল? সে জানে, প্রেম মানুষকে ভালো রাখে। ভালোই থাকতে চায় সে। সুখানুভূতিতে থাকবে। কিন্তু জাসমিন কখনো সেই ভিখারিনির বিকল্প নারী নয়। আর একটি নারী। আর একটা প্রেম। আর এও সে জানে এই প্রেম সে গ্রহণ করবে, কিন্তু কাউকেই সে বিয়ে করতে পারবে না।

সেই জ্যোতিষ জানা নারীর কথা সহসা তার মনে পড়ে যায়। সেই ভিখারিনির কাছে সে নাকি কোনোদিন পার্থিব জিনিস চাইবে? ভুল জ্যোতিযচর্চা করেছে, সেই নারী, এই ভবিষ্যদ্বাণী মিথ্যা। এ কথা মনে আসতে মনে এক ধরনের খচখচানি এসে বসে। তার বিরুদ্ধে কেউ কিছু বললে সহ্য করতে পারে না। নিজের কোনো ত্রুটি নেই, নির্দোষ মানুষ। সে যা করে, যা ভাবে, সব ঠিক, তার বিরুদ্ধে কেউ কিছু বলতে পারবে না। সেই জ্যোতিষী নারীকে ভুলে যেতে চায়, তার ভবিষ্যদ্বাণীও ভুলে যেতে চায়। কেন মনে পড়ল? মনটা এক রহস্যময়। আর সে জন্য তার ব্যথার এক জায়গা তৈরি হয়েছে। কত তার টাকা, কত তার টাকা আসছে, কত আরও টাকা উপার্জন করবে, সে কিনা এক ভিখারিনির কাছে কিছু চাইবে? যে ভিখারিনিকে সে ভালোবাসে, যার রূপে সে মুগ্ধ হয়েছে। এতখানি সে হীন হবে কী করে?

ভাবতে ভাবতে আবার সেই ভিখারিনির ভাবনা তার মনের মধ্যে ফুটে ওঠে। যার রূপ সে দেখেছিল এক মুহূর্তের জন্য। যাকে সে হন্যে হয়ে খুঁজে বেড়াচ্ছে। সজ্ঞানতার চোখে তাকে কেমন দেখতে? সে নাকি তার রূপ লুকিয়ে রাখে। তাকে খুঁজে বের করতেই হবে। আর নিজেই খুঁজে বের করবে। ওই ফ্ল্যাটে উদ্বোধনের তাড়ায় যত ঝামেলায় জড়িয়ে পড়ছে, ততই আকাঙ্ক্ষা বাড়ছে সেই ভিখারিনির প্রতি। কিন্তু নতুন করে, নতুন রকম অভিযানে যেতে পারছে না। এত ঝামেলা এত সমস্যাকাতর হওয়ার জন্যই বোধহয় জাসমিনের প্রেম-ছোঁয়া মেসেজগুলো ওর ভালো লাগল। বুঝতে পারল, সে ভালো নেই।

৩৫ সুখ যেন আরও কিছু। সেই আরওটা কী?

কদিন ধরেই ফাহমিদার মাথার যন্ত্রণা হচ্ছিল। আজ দুপুরে ভয়ংকর মাথার যন্ত্রণা করে। বিছানায় ছটফট করেছে, কাতরেছে ফাহমিদা। জাসমিন অন্য ঘরে ছিল প্রথমটা জানতে পারেনি। বিকেল হয়ে গেল বড়োবুবু কেন বেরোচ্ছে না, ঘরে ঢুকে দেখে যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছে বড়োবুবু। প্রথম মাথায় জল দেওয়ার ব্যবস্থা করে। তারপর ঠান্ডা তেল দিয়ে দেয়। কিন্তু কিছুতেই যন্ত্রণা সারছে না। ছেলেমেয়েরাও তখনও স্কুল থেকে ফেরেনি। সাহিল ফিরবে সেই রাতে। জাসমিন নিজেই ফোন করে ডাক্তার

হাজরাকে কল দেয়। সন্ধ্যায় আসেন ডাক্তার হাজরা। দেখেন, আপাতত কিছু ওষুধ তিনি দিয়েছেন। তিন দিনের ওষুধে না সারলে অন্যত্র দেখাতে হবে। বিশেষজ্ঞ ডাক্তার দেখবেন। ডাক্তার হাজরা ফোনে সাহিলের সঙ্গে কথা বলেন। তিনি সন্দেহ করেছেন মাইগ্রেন। সে-রকম কিছু ওষুধ দিয়েছেন। মাথার যন্ত্রণা থাকলে মানুষ ঘুমোবে কী করে? তাই রাতে ঘুমের ওষুধ দিয়েছেন।

সাহিল ডাক্তার হাজরার চেম্বার থেকে প্রেসক্রিপশন আনিয়ে নেয় একজন কর্মচারীকে পাঠিয়ে। তারপর ওষুধ কিনে বাড়িতেই কর্মচারী মারফত পাঠিয়ে দেয়। রাত আটটার সময় জাসমিন তাকে খাবার খাইয়ে ওষুধ খাইয়ে দেয়। রাত সাড়ে আটটার সময় সাহিল ফোনে জানতে পারে ফাহমিদা ঘুমোচ্ছে। ঘুমের ওষুধে ঘুমোচ্ছে, না মাথার যন্ত্রণা কমেছে, তা জানা যায়নি।

রাত দশটায় বাড়ি ফিরল সাহিল। ফ্ল্যাট বাড়ি উদ্‌বোধনের তারিখ স্থির হওয়ায় ব্যস্ততা বেড়েছে তার। কোনোদিকে তাকাবার ফুরসত নেই। ফাহমিদার অসুস্থতার খবর পেয়ে যে একটু তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরবে, তার জো নেই।

বাড়ি ফিরে সাহিল দেখল বাড়ির সবার চোখে মুখে খুশি। কেন না ফাহমিদা ভালো আছে, ঘুমোচ্ছে। ছেলেমেয়েরা খুশি, জাসমিন খুশি, কাজের মেয়েও খুশি। আজ প্রাইভেট টিউটর শুধু ফিরে গেছে।

আর ছেলেমেয়েদের ভিতর জাসমিন আরও খুশির আবহ তৈরি করেছে, আজ রাতে জাসমিন বিরিয়ানি করে। সাত তাড়াতাড়ি সাড়ে দশটার মধ্যে ছেলেমেয়েদের সঙ্গে বিরিয়ানি খেয়ে নিতে হল। তারিফ করল জাসমিনের। সবাই একসঙ্গে বসেই খাওয়া গেল। তাদের মা ভালো আছে। বিরিয়ানি খাওয়া গেল আনন্দ করে। ছেলেমেয়েদের মধ্যে জাসমিনের প্রভাব যথেষ্ট। জাসমিন ওদের এক একদিন এক এক রকম সারপ্রাইজ দেয়। জাসমিনের এই উদ্যোগ ও উদ্ভাবনী শক্তি প্রশংসনীয়। চমৎকার হাসিখুশি মেয়ে। যেমনই চটপটে, তেমনই যত্নশীলা। মুহূর্তে কাউকে আপন করে নিতে পারে, এ ক্ষমতা তার আছে। আর ফাহমিদা তো এখন অসুস্থ, সারা বাড়িটা জাসমিনের হাতে চলে গিয়েছে। এমনটা দেখে সাহিলের ভালো লাগা শুধু নয়, উজ্জীবিত হয়। ভালো থাকার মধ্যে প্রাণ এসে জোটে।

খাওয়া দাওয়ার পর ফাহমিদাকে দেখতে ঘরে ঢুকল সাহিল। তেমনই অঘোরে ঘুমোচ্ছে। কপালে হাত বুলোয়। বোধহয় ফাহমিদা বুঝতে পারে না। ঘুমের মধ্যে থাকে। জাসমিন এসে মৌরি দিয়ে যায়। ঘুমন্ত ফাহমিদার মাথার আঁচল খসে গিয়েছিল, মাথায় আঁচল তুলে দেয়। ফাহমিদারও স্বভাব শোয়ার সময়, ঘুমের সময় মাথার আঁচল ঢাকা দিয়ে সহবতের সঙ্গে ঘুমোয়। তার বিশ্বাস, মাথার কাপড় সরে গেলে নাকি খারাপ স্বপ্ন দেখবে।

ফাহমিদার দুঃস্বপ্নের প্রতি বরাবরের আতঙ্ক। কতবার কতরাত দুঃস্বপ্ন দেখে আঁতকে উঠেছে। আর সাহিলকে ঠেলে তুলেছে। সাহিলের কাছ থেকে জল চেয়েছে। সাহিল জল এনে খাইয়েছে। তখন বলতে পারেনি দুঃস্বপ্নের কথা। ভয় পেয়েছে। আর তাকে সাহস দিতে বাকি রাতটা জড়িয়ে শুয়েছে সাহিল। কপালে হাত বুলিয়ে দিয়েছে। ঘুম পাড়িয়ে দিয়েছে।

অন্য সময় দুঃস্বপ্নের বর্ণনা দিয়েছে, কোনা কুৎসিত লোক তাকে তাড়া করেছে। যেখানেই যাচ্ছে লোকটা এসে দাঁড়াচ্ছে তার সামনে। কিংবা গোরস্থানে ঢুকে পড়েছে, সেখানে কবরের গর্তে পা পড়ে যাচ্ছে। কিংবা সব মৃত মানুষদের সঙ্গে কথা বলছে সে। কিংবা কোনো ভয়ংকর সাপ তার পিছু পিছু ছুটছে। এমন দুঃস্বপ্ন প্রায়ই দেখে থাকে ফাহমিদা।

সাহিল নিজের স্বপ্নের কথা বলতেই পারে না। কেন না স্বপ্ন যখন দেখে সেই সময়ই মনে থাকে। পরে বলতে পারবে না। বোধ হয় ফকিরপাড়া নিয়ে আর ফকিরকে নিয়ে মাঝে মাঝে স্বপ্ন দেখে। সে তো সুখস্বপ্ন। দুঃস্বপ্ন সে দেখেই না।

ফাহমিদা অসুস্থ হয়েছে, সেজন্য ফাহমিদার প্রতি এক প্রেমবোধ ও স্নিগ্ধ অনুভূতি আসে তার মনে। অনেক রাত পর্যন্ত ফাহমিদার বিছানার পাশে পড়ে থাকবে সে। লক্ষ করে যাবে। ঘুম ভেঙে গিয়ে একা একা মাথার যন্ত্রণায় ছটফট না করে। তাকে শুশ্রূষা দেবে সাহিল। জীবনে সেবাযত্ন ফাহমিদাকে কখনো করার সুযোগ পায়নি সে। ফাহমিদাই সেবাযত্ন করে যায়। প্রায়ই পা টিপে দেয়, মাথা টিপে দেয়। জল চাইলে সে অপেক্ষা সহ্য করতে পারে না। সঙ্গে সঙ্গে ফাহমিদাকে দিতে হবে। তেমনই প্রস্তুতি থাকে ফাহমিদার। ফাহমিদার প্রতি কি সাহিল অত্যাচার করে? এই যে সব দৈনন্দিনের স্বভাব, ব্যবহারভঙ্গির একতরফা আগ্রাসনে ফাহমিদা কি খুবই নির্যাতনকাতর? নাকি সে এই সব আচরণের দাসত্ব ভালোবাসে? ফাহমিদা কি খুব অসুখী? তার অসুখীর কথা তো কোনোদিন বলেনি। অভাব অভিযোগের কথাও তার মুখ থেকে শোনা যায়নি। সব কিছু শোকর করে। সব কিছুতে পরিতৃপ্তি প্রকাশ করে।

আজ ফাহমিদা অসুস্থ হয়েছে বলে, এতসব কথা মনে এল ফাহমিদাকে নিয়ে। নিজেকে পাল্টা প্রশ্ন করে সে কি খুব সুখী? সুখের দৈন্য আছে নিশ্চিত, কিন্তু সুখের পরিপূর্ণতার হদিস তার জানা নেই। সুখ যেন আরও কিছু। সেই আরওটা কী? তা তো জানে না।

আরও একবার ফাহমিদার দিকে ঝুঁকে পড়ে ফাহমিদার কপালে হাত বুলোয়, আরও একবার ভালোবাসা জানায়। জাসমিন পাশে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখে। জাসমিনকে দেখতে দেয়। নিশ্চয় এর মধ্যে প্রেম আছে, এর মধ্যে সম্পর্কের সুধা আছে। তার রূপ কী, স্বাদ কেমন? তা তো বলতে পারবে না।

সাহিল খারাপ হতে পারবে না ফাহমিদা জানে, জাসমিনও জানে। ভিখারিনির প্রতি তার প্রেমটা তার খারাপ হওয়ার লক্ষণ জানে এরা। সেইভাবে ওরা বিচার করেছে। কিন্তু সে তো শুধুই প্রেম। আর কোনোভাবে তার স্খলন তো থাকবে না, থাকতে নেইও। ভিখারিনির কথা সহসা মনে পড়ে যায়। সেই ভিখারিনি কি সত্যি কেউ আছে, না অলীক কল্পনা, যা সে রচনা করে চলে? যদি থাকত, তাহলে তো তার দেখা পেত। দেখা পাওয়ার জন্য নিশ্চয় তাকে আরও সচেষ্ট হতে হবে কি? আরও অপেক্ষা করতে হবে কি? জানে না। কিছুই জানে না।

৩৬. নিজেকে ছাড়িয়ে নেওয়ার জন্য জাসমিনকে খানিকটা আঘাত করেছে।

একটু রাত বেড়েছে। ফাহমিদা ঘুমোচ্ছে দেখে বারান্দায় এসে বসেছিল সাহিল। তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়ার স্বভাব নেই। তাছাড়া ফাহমিদার শিয়রে জাগার ইচ্ছা তার। এখন বারান্দায় জেগে পড়ে আছে।

সে ঘুমোচ্ছে না দেখে জাসমিনও পাশে এসে বসল।

সাহিল স্থির হতে চাইল। নিশ্চিন্ত মনে থাকতে চাইল। মন ঘন রেখে নিশ্চিন্তে থাকতে চাইল। চাইল নৈঃশব্দ।

জাসমিন শুধোলো, 'কেমন দেখলেন?'

সাহিলের নিশ্চিন্ততা নড়ে। কিছু উত্তর করে না।

জাসমিন আবার শুধোয়, 'বড়োবুবুকে কেমন দেখলেন।'

'ভালোই তো।'

'সে যন্ত্রণা তো আপনি দেখেননি!'

'খুব কষ্ট পেয়েছে নাকি?'

'খুব'।

'আমাকে কিন্তু আগে জানাওনি।'

'আগে ডাক্তারকে জানিয়েছি। তাছাড়া আপনি কত ঝামেলায় থাকেন!'

আবার চুপচাপ বসে থাকে সাহিল।

কিছুক্ষণ পর আবার জাসমিন শুধোয়, 'আপনি কি ঘুমোবেন না?'

'দেখি।'

'দিদির জন্য জাগবেন।'

'ঘুম আসছে না?'

'সত্যি কথা বলতে পারছেন না?'

'হ্যাঁ, ফাহমিদার জন্য কিছু একটা হচ্ছে। ঘুম আসছে না।'

'আমার সঙ্গে কথা বলতেও চাইছিলেন না!'

সাহিলের ভালো লাগল জাসমিনের হাসিটা।

জাসমিন হাসে। বরং জাসমিনের সঙ্গে কথা বলার মধ্যে বেশি ভালোলাগা আছে, কথা বলার ভিতব বুঝল। 'তুমি ঘুমোবে না?'

'ঘুম আসছে না। তাছাড়া আপনি'—

'আমার জন্য এত ভাব কেন বল তো —আমি কি শিশু?'

'না, তা নয়।' আবার হেসে ওঠে জাসমিন। 'কেউ তো জেগে নেই, আমরা দুজনে জেগে থাকব শুধু।'

'ফাহমিদা মাথার যন্ত্রণায় আবার জেগে উঠতে পারে।'

'ঘুমের ওষুধ দেওয়া হয়েছে। ঘুমোবে সারারাত।'

আবার নীরব হয়ে পড়ে সাহিল। নিজের কাছে ফিরে যায়। তার সঙ্গে যে জাসমিন জাগছে, ভালো লাগছে। তার সঙ্গে যে মাঝে মাঝে কথা বলছে, ভালো লাগছে। কিন্তু তার মাঝে মাঝে নীরব হতে ভালো লাগছে। নীরবতা, নৈঃশব্দও চায়।

'আপনি বড়োবুবুকে খুব ভালোবাসেন না।'

কোনো উত্তর করে না সাহিল।

'আমি জানি, আমাকে ভালোবাসেন না।'

'কে বলল? তোমাকে তো ভালোবাসিই। তুমি আজ বিরিয়ানি বানিয়েছিলে, তারিফ করা হয়নি। বেশ হয়েছিল।'

'থাক, আর বলতে হবে না।'

'রাগ কোরো না।' জাসমিনের ডান হাতটা হাতে নেয়, 'এই তো।'

'আমি যে এটা চাইছিলাম আপনি কী করে বুঝলেন?'

'আমি বুঝি।'

'আপনার চাওয়া ছিল না?'

'হয়তো।'

'হয়তো কেন?'

'অমি নিজেকে খুব একটা বুঝি না।'

'আপনি শুয়ে পডবেন একটু পরে?'

'জানি না।'

'আসুন না আমরা সারারাত জাগি।'

'তোমার কথায় মুগ্ধ হয়ে পড়ি, সঙ্গে মুগ্ধ হয়ে পড়ি। কিন্তু'—

'থামলেন কেন, বলুন?'

'তুমি বরং শোওগে। অন্যায় হচ্ছে।'

'আমাকে দেখলে যে আপনার দুষ্টুমি কবতে শখ যায়!'

এই প্রলোভনের সামনে ধ্বস্ত হয়ে পড়ে নীরবে, কিছু বলতে পারে না। সেও

তো রক্তমাংসের মানুষ। সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে। ফাহমিদাকে ঘুমের ওষুধ দেওয়া হয়েছে। একেবারে অচৈতন্য ঘুমুচ্ছে ফাহমিদা। আর রাত বাড়ছে, রাত ঘন নিবিড় হয়ে উঠেছে। তার তৃষ্ণা বাড়ে বই কমে না। নিজেকে নিবৃত্ত করে, শান্ত রাখে। জীবন জুড়ে এত প্রলোভন থাকে কেন? জীবন জুড়ে এত পাপ ও স্খলনের মুখোমুখি হতে হয় কেন? ক্রমশ দুর্বল হয়ে পড়ছে। সে জানে, তার পক্ষে নীচতা সম্ভব হবে না। হাতের স্পর্শ হাতের মধ্যে নেয়। কামনায় জর জর হয়ে ওঠে। জীবনে ভোগের এত হাতছানি কেন?

জাসমিন দেখল সাহিল হাত ধরে আছে বটে, হাত ধরার সুধায় নেই, হাত থেকে হাত এখুনি স্খলিত হয়ে পড়বে। কোথায় যেন খোয়া গেছে। কোনো সম্পর্কছিন্নতায় আছে।

নিজেই হাতটা ছাড়িয়ে উঠে পড়ে রাগে। সোজা চলে যায় নিজের ঘরে।

ঘরে খিল দিল কি? তা তো জানে না সাহিল। খিল কখনো দিতে পারে না। সাহিল একা মনে বসে থাকে। অনেকটা সময় পার করে দেয়। এতক্ষণে বোধহয় জাসমিন ঘুমিয়ে পড়েছে।

চুপিচুপি জাসমিনের দরজা ঠেলে ঘরে ঢোকে সাহিল। ঘরের ছোটো আলোটা জ্বলছে। কাছে গিয়ে দেখল ঘুমিয়েই পড়েছে। খুব নিশ্চিন্ত হল সাহিল। ফেরার সময় খুব ইচ্ছে হল জাসমিনের কপালে আলতো করে একটা চুমু খেতে।

সাহিল ঠোঁট নামাল যেই ঘুমের ভান করে পড়ে থাকা জাসমিন তার দু-হাত দিয়ে গলা জড়িয়ে ধরে, আর নিজের দিকে টানে।

সাহিল সহসা এক হ্যাঁচকা মেরে জাসমিনের হাত থেকে নিজেকে সরিয়ে নিল। নিজেকে ছাড়িয়ে নেবার জন্য খানিকটা জাসমিনকে আঘাত করেছে। সাহিলের এই অনমনীয় আচরণে জাসমিন দু-হাত মুখে চাপা দিয়ে ডুকরে কেঁদে উঠল। কাঁদতে থাকল, অনেকক্ষণ ধরে কাঁদতে থাকল। সাহিল যখন ফাহমিদার পাশে শুয়েছে, তখনও কান্নার শব্দ পেল জাসমিনের।

৩৭. আবার স্বপ্নটা যদি দেখি আর ঘুমোব না।

অবশেষে আজ রাতে জাসমিনের বিছানায় সাহিলের পদস্খলন হল। এখন সে ফাহমিদার পাশে শুয়ে আছে। ফাহমিদা ঘুমুচ্ছে, সে ঘুমোতে পারছে না। রাত ক্রমশ প্রত্যূষের দিকে ছুটছে। কেন যে ঘুমোতে পারে না! জেগে পড়ে থাকে। আর ভাবে, তাব অধঃপাতের কথা। জাসমিন আজও রাতে বিছানায় শুয়ে ডুকরে ডুকরে কাঁদছিল। আর সাহিল যায়। প্রলোভন তাকে ধীরে ধীরে গিলে ফেলে, সে আস্ত মানুষটা পাপে পরিণত হয়। ঘটনার কষ্ট অনুভব করল খুব, বিছানায় ফাহমিদার পাশে ফিরে এসে। কেন এই ঘটনায় গেল? সে তো জাসমিনকে বিয়ে করেনি। বিয়ে করতেই পারে,

ফকিরপাড়া ছাড়তেই পারে। তারপর না হয়!

রাত ক্রমশ ফুরিয়ে যেতে বসেছে। ফাহমিদা অকাতরে ঘুমোচ্ছে। তার পাশে একজন মানুষের মন কাটা পোনার মতো ছটফট করছে, সে খবর রাখে না ফাহমিদা। জাসমিন তাকে গিলে খেয়েছে। এ অন্যায়, পাপ। পুরুষমানুষের সঙ্গে কোনো নারী যদি খেলে, সে খেলায় নারীরই জয় হয়। সৃষ্টি কাহিনিতে সে কথাই আছে।

ফাহমিদার ঘুমের পাশে ঘন হয়ে শুয়েছিল। ঘন ঘন নিশ্বাস পড়ছিল তার। আর ঘুমুতে পারছিল না। ঘুমিয়ে পড়লে অনেক উদ্বেগ-যন্ত্রণা দূর হত। যেন জেগে থাকা তার আত্মপীড়ন, স্বঘোষিত শাস্তি। তার ভিতর মরে আছে সে।

'শুনছ আনিসার আব্বা'—ভয়ার্ত ডেকে ওঠে ফাহমিদা।

যেন কিছু টের পেয়েছে মনে করে সাহিল। বলে, 'কী হয়েছে।'

সাহিলের বাঁ হাতটা বুকের ওপর তুলে দেয় ফাহমিদা, 'খুব ভয়ের স্বপ্ন দেখেছি।'

'আজও?'

'আমার নিশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে। তুমি আলোটা জ্বালাও, অন্ধকার সহ্য করতে পারছি না।'

সাহিল আলো জ্বালাতে ফাহমিদাকে ছেড়ে উঠতে যায় অথচ তার বাঁ হাতটা বুকের মধ্যে ফাহমিদা জোরে চেপে ধরেছে।

'ভয় করছে!' ফিস ফিস করে বলে ফাহমিদা।

'কীসের ভয়, আমি তো আছি।'

'না, তুমি কাছ থেকে যাবে না।'

'তবে সে আলো'—

'পানি, পানি খাব — গলা শুকিয়ে গেছে।'

'হাত ছাড়ো, তবে তো।'

'না, তুমি যেতে পারবে না।'

'শান্ত হও, এই তো আলো জ্বালছি, পানি আনছি তোমার জন্যে।'

'তুমি আমার কাছেই ফিরে আসবে তো?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, এই তো ঘরের মধ্যেই থাকব।'

ফাহমিদা হাতটা ছেড়ে দেয় আর কাঁপতে থাকে।

খাটের নীচে নেমে আলো জ্বালায় সাহিল। তারপর জগ থেকে জল গেলাসে ঢেলে আনে ফাহমিদার কাছে। গালে একটু ঢেলে দেয়।

ফাহমিদা বলল, 'কিছু একটা গায়ে চাপা দিয়ে দেবে, শীত করছে।'

'পায়ের নীচে তো চাদর রয়েছে।'

'তুমি গায়ে ঢাকা দিয়ে দাও।'

'এই তো আলো জ্বলছে, সবকিছু দিনের মতো। আর আমিও তোমার কাছে।' গায়ে চাদরটা ঢাকা দিয়ে দেয়।

ফাহমিদা কাঁপতে কাঁপতে বলল, 'তুমি তো ছিলে না স্বপ্নে।'

'ছিলাম না?'

'না। এক রাক্ষসী এসেছিল আমার কাছে। উহ্ তার কী লম্বা লম্বা দাঁত!'

'কে সেই রাক্ষসী?'

'সেই ভিখারিনিটা। আমার বিছানার পায়ের তলায় উঠে এল খিল খিল করে হাসতে হাসতে। দাঁতগুলো লম্বা আর বাঁকানো। আমার পা ধরছিল। ভিক্ষে করছিল তোমাকে আমার কাছ থেকে। আর পায়ে দাঁত দিয়ে কামড়াচ্ছিল।'

'তখন হয়তো মশা কামড়াচ্ছিল।'

'না, আমি চোখ বুজলে এখনও দেখতে পাব।'

'শান্ত হও দেখি, স্বপ্ন স্বপ্নই। এ তো সত্যি নয়।'

'কেন আমি এমন দেখলাম?'

'ওসব ফালতু স্বপ্ন।'

'ভিখারিনি কি তোমার সব সর্বস্ব হবে?'

'আমার সঙ্গে কোনোদিন তার দেখা হয়নি।'

'আমি স্পষ্ট ভিখারিনিকে দেখেছি। যেমন নোংরা আর তেমনি কুৎসিত মুখের চেহারা।'

'সে কিন্তু খুব সুন্দর, রূপ আছে।'

'আমি তার রূপ দেখিনি। সে তো ভিখিরি। সে সবসময় চায়। আমার কাছ থেকে তোমাকে ভিক্ষা চাইল। এই কুৎসিত ভঙ্গিটি আমাকে বেশি ভয় ধবিয়েছে। আমার পা ধরছিল। তারপর দাঁত দিয়ে অল্প কামড়াচ্ছিল। আদর করে যেমন করে কুকুররা কামড়ায়। আমি ভীষণ ভয় পেলাম তাতে। বল, ভয় পাওয়ার মতো স্বপ্ন নয়?'

'তোমার কপালে হাত বুলিয়ে দেব, তুমি কি আবার ঘুমিয়ে পড়তে চাও?'

'না। আবার স্বপ্নটা যদি দেখি। আমি ঘুমোব না।'

'চল বরং বারান্দায় গিয়ে বসি, ভোর হয়ে উঠছে।'

হাত ধরে টানতেই উঠে আসে ফাহমিদা। মেঝেতে দাঁড়ায়। চুলে খোঁপা বানায় দু-হাত পেছন দিকে নিয়ে গিয়ে। তারপর শাড়ি ঠিকঠাক করতে থাকে। সাহিলের খুব ইচ্ছে হয় পুরোনো দিনের মতো পেছন থেকে ফাইমিদাকে জাপটে ধরতে। মুহূর্তে বাসনা উন্মূল হয়েছিল, বাসনাকে মরে যেতে দেয়। ফাহমিদা এখন সেই সোহাগের অনুকূল অবস্থায় নেই। কিংবা পেছন থেকে ঘাড়ে একটা চুমু খেত যদি।

ফাহমিদা নিজে নিজে ঠিক হচ্ছে। নিজে জল নিয়ে খেল। ঘরের ভিতরের পাখাটা নিভিয়ে দিল। তারপর তাকাল সাহিলের দিকে, সাহিলের আশ্রয়ের জন্য। সাহিল এসে হাত ধরে তাকে নিয়ে যায় বারান্দায়। বারান্দায় সেই দুটি চেয়ার আছে, যে-চেয়ার দুটিতে সাহিল আর জাসমিন বসেছিল। একসময় জাসমিনের হাত মুঠোর মধ্যে নিয়েছিল। এখন আবার প্রেমানুভূতিতে ফাহমিদার বাঁ হাতটা হাতের মধ্যে নিয়ে নেয় সাহিল। 'আর ভয় করছে?'

'না, তবে স্বপ্নটা ভয়ানক!'

'তুমি তো দুঃস্বপ্ন দেখে থাক।'

'যতদিন তোমার সংসারে এসেছি, ততদিন দুঃস্বপ্ন দেখছি।'

'আর শীত করছে?'

'না। ভয় পেলে আমার শীত করে।'

'মাথার যন্ত্রণা?'

'ঘুম পুরো হয়ে গেছে, আর মাথার যন্ত্রণা নেই। ঘুম হত না বলে বোধহয় মাথার যন্ত্রণা হত।'

'ডাক্তারকে বলবে।'

'আমাকে প্রতিদিন রাতে ঘুমের ওষুধ খেতে হবে।'

'বেশ। হাতের মধ্যে আরাম পাচ্ছ?'

'খুব। তোমার হাতের স্পর্শ খুব ভালো।'

'দেখছ ভোর। পুবের দিকটা কেমন লাল হয়ে উঠছে?'

'হাত ছাড়ো, ওজু করে আমি ফজরের নামাজ পড়ব।'

'পাঁচ মিনিট পরে যেও।'

'না, নামাজ কাজা হয়ে যাবে। অনেকক্ষণ আজান দিয়েছে।'

হাত ছেড়ে দেয় সাহিল।

ফাহমিদা ওজু করতে নীচে নামতে যায়।

সাহিল বলে, 'তুমি নামাজ পড়লে খুব ভালো থাক ফাহমিদা।'

৩৮. ব্যবসায় কোনো খাতির পছন্দ করে না।

সকাল তখন সাতটা। সাহিল তখন বাথরুমে ঢুকেছে। ফাহমিদা সংসারের কাজে স্বচ্ছন্দ গতিতে ঢুকে গেছে। জাসমিন ঘর গুছোচ্ছে। বিছানা ঝাড়ছে। ছেলেমেয়েরা পড়তে বসেছে।

অমনি নীচে গেটের বাইরে হই চই শোনা গেল। কীসের যেন জটলা। বারান্দার ঘুলঘুলি দিয়ে জাসমিন দেখে, বুঝতে পারে না। দুলাভাই বাথরুমে ঢুকেছে, তার দেখভাল করার দায়িত্ব তার। দুলাভাইয়ের সঙ্গে সকালে চোখাচোখি হয়েছে। মুচকি

হাসি দিয়েছে সে। জামাইবাবুর মনে-মুখে প্রসন্নতা থাকলেও ঝামেলা আছে বোঝা গেল।

নীচের থেকে নসিবা খালা হাঁকল, কারা যেন সাহিলের সঙ্গে দেখা করতে এসেছে। জাসমিন হেঁকে জানাল, সে বাথরুমে। এখনও বেরোতে দেরি আছে।

ফকিরপাড়ার সবচেয়ে প্রবীণ ব্যক্তি ফতে আলি এসেছে এই সকালে সাহিলের সঙ্গে দেখা করতে। প্রায় একশো বছর বয়স হতে চলল ফতে আলির। চোখে তেমন দেখতে পান না। ফকিরপাড়ার মহিমার কথা তার মুখ থেকে শোনা যায়। এখনও কণ্ঠস্বর আছে, আছে কিছু স্মৃতি, আর সজ্ঞানতাও। সাহিল ফকিরপাড়ার মহিমাকে আত্মগৌরব মনে করে বিশ্বাস করে বলে ফতে আলির প্রতি তার এক সম্ভ্রম আছে। একই বংশের তারা। চাশতো দাদা সম্পর্কে। নানা সময়েই ফতে আলি দাদার কাছে গিয়ে থাকে সাহিল। সে তো ফকিরপাড়ায় গৌরবগাথার সংশ্রব ধারাবাহিক রাখতে।

বাথরুমে দরজা ধাক্কায় 'দুলাভাই, কারা আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছে যেন। তাড়াতাড়ি বেরোন।'

ভেতর থেকে বলল সাহিল, 'আহ, দেরি আছে।'

আবার বাথরুমের দরজায় ধাক্কা মারে জাসমিন। সাহিলকে ব্যস্ত করে তোলে। দেখা করতে এসেছে তো বসার ঘরে এসে বসবে। এত তাড়াহুড়ো কীসের? নিশ্চয় চাঁদা চাইতে এসেছে।

'ও দুলাভাই একজন মরণাপন্ন বুড়ো লোককে কারা যেন এনেছে। চেয়ারে করে শুইয়ে এনেছে।'

'সে কি, ফতে দাদা নাকি?'

'কি জানি!'

'দাঁড়াও আমি বেরোচ্ছি।'

ফতে আলিকে এই সকালে আরাম চেয়ারে শুইয়ে যেমন করে গ্রামের অসুস্থ মানুষকে হাসপাতালে নিয়ে যাওযা হয়, তেমনভাবে দুজন মজুর ভাড়া করে রহমত তার ছেলে রাহাতকে সঙ্গে করে বৃদ্ধ আব্বাজিকে এনেছে সাহিলের বাড়ির দরজায়। রহমত ফ্ল্যাটের নীচে একটা দোকান চেয়েছিল, ছেলে রাহাতের জন্য। সিডি ভিসিডির দোকান দেবে। একদিন বৃদ্ধ পিতাকে দিয়ে সাহিলকে বলিয়েছিল রহমত। তা সত্ত্বেও কিছু হয়নি। সাহিল পুরো টাকা দিয়ে বুক চাইছে। সে টাকা দেওয়ার সংগতি নেই রহমতের। দেড় লাখ টাকা চাইছে। পঞ্চাশ হাজার টাকা কোনোক্রমে দিতে পারবে। দোকান চললে মাসে মাসে শোধ করবে। একই পাড়ার মানুষ আত্মীয় হয়, সে যদি না দেখে তো কে দেখবে। সাহিল বড়ো একগুঁয়ে। ব্যবসায় কোনো খাতির পছন্দ করে না। দুদিন পরেই ফ্ল্যাট উদ্‌বোধন হবে। এখনও সময় আছে বুঝে শেষ চেষ্টা

করতে চলে এসেছে রহমত। আর সাহিল ফতে আলিকে খুব শ্রদ্ধা-সম্মান করে, তার সুপারিশ কি ফেলতে পারবে!

ফতে আলি নিজে হেঁটে আসতে পারেন না। উঠে বসতেই কষ্ট হয়। তাছাড়া পেচ্ছাপজনিত সমস্যাও আছে। ঘন ঘন মূত্রত্যাগ করতে হয়। এই অসুবিধে সত্ত্বেও তাঁকে নিয়ে এল সাহিলের বাড়িতে নিরুপায় হয়ে। আব্বাজির অনুরোধ শোনে সাহিল। এই শেষ চেষ্টা তার।

ফতে আলি শুধোলে, 'কই, এসেছে সাহিল?'

নাতি রাহাত পকেট থেকে মোবাইল বের করে ফোন ঠুকে দিল সাহিলের নম্বরে।

সাহিল বাথরুম থেকে বেরিয়ে শুনতে পেল তার মোবাইল বাজছে।

মোবাইলে রিং শুনে ফতে আলির হাতে মোবাইলটা ধরিয়ে দিল রাহাত। 'কথা বল দাদা তুমি।' মোবাইলটা কানের কাছে ধরিয়ে দেয়।

দিব্যি মোবাইলটা কানের কাছে ধরে ফতে আলি বলে ওঠে, 'ভাই সাহিল, সাহিল।'

মোবাইলটা ধরে সাহিল, 'হ্যালো কে বলছেন?'

'সাহিল ভাই, সাহিল ভাই?'

'হ্যালো কে বলছেন?'

'আমি গো, ফতে আলি।'

'ও দাদা, আপনি! আপনি তো'—

'তোমার দরজায় এই গুনাগার বান্দা, তুমি একবার দেখা দাও।'

'আমি যাচ্ছি তো।'

'আমার কি অপেক্ষা চলে, এই আছি এই নেই।'

'আপনি এলেন কেন? আমিই তো যেতে পারতাম।'

'আমার দরকার আমাকে আসতে হল।'

'দরকারটা কী শুনি?'

'ওই দোকানটা দাও ভাই, নাতিটাকে।'

'দেড় লাখ টাকা না দিলে হবে না।'

'পরে শোধ করে দেবে।'

'আমি ব্যাবসার সততা হারাতে চাই না।'

'আমি যে তোমার দরজায় এলাম?'

'আমি যাচ্ছি আপনাকে সালাম করে আসব, মোসাফা করব। আমি আপনার দোওয়া নিয়ে আসব।'

'এসো'। ফোনটা রেখে দেন ফতে আলি। তাঁরপর তার পেচ্ছাপ পায়। ছেলে রহমত সে ব্যবস্থা করে। পটটা কোলের কাছে ধরে।

সাহিল নেমে এসেছে। ফতে আলির পেচ্ছাপ শেষ হওয়ার অপেক্ষা করে। উঁকি ঝুঁকি পাড়ার লোকও জমেছে। সবাই দেখছে ফতে আলিকে। ফতে আলি ফকিরপাড়ার সবচেয়ে প্রবীণ মানুষ। ফকিরপাড়ার গৌরবের প্রবীণ বাহক ও বিশ্বাসী। সাহিলেরও সেই বিশ্বাস আছে বলে ফতে আলির প্রতি সে শ্রদ্ধাবনত, আদরণীয়।

সাহিল মাথা নুইয়ে ফতে আলির সামনে দাঁড়িয়েছিল। ফতে আলির পেচ্ছাপ হয়ে যাওয়ার পর ফতে আলির পায়ে সালাম করে সাহিল। ফতে আলি তার মাথায় হাত ছুঁইয়ে করাঙ্গুলি ঠোঁটে ঠেকিয়ে চুম্বন করেন। দোওয়া করেন। সাহিল ফতে আলির সঙ্গে হাতে হাত দিয়ে মোসাফা করে।

ফতে আলির শূন্য দৃষ্টি। ঠোঁট কাঁপছে। মুখের লোল চামড়া কাঁপছে। কোনো কথা বলতে পারছেন না। ধীরে ধীরে কাঁদতে শুরু করলেন।

মুখে হাত ছোঁয়ায় সাহিল। 'কাঁদবেন না।'

কান্না থামিয়ে শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকলেন ফতে আলি।

রহমত বলল, 'যা বলতে এসেছ বল না, আব্বুজি।'

ফতে আলি শুনতে পাননি, এমনটা অভিব্যক্তিতে জানালেন। পাশের লোককে শুধোলেন, 'কী বলছে?'

রাহাত বলল, 'আপনি সাহিলদাদাকে কী বলতে এসেছিলেন বলুন না।'

এবার শুনতে পেয়েছেন। 'না, আমার তো কিছু বলার নেই।' যেন কোনো কথা মনে পড়ে গেল। বলে উঠলেন, 'হ্যাঁ দোওয়া করতে এসেছি। সাহিল ভাইকে আল্লা আরও বড়ো করুক।' হাত তোলেন তিনি আল্লার দরবারে। 'আল্লাপাক পরোয়ারদিগর!'

সাহিল জানতে পারল ফতে আলির সঙ্গে তাঁর মোবাইলে কথা হয়ে গেছে, এখন আর কোনো কথা বলবেন না। যে কথা বলতে এসেছিলেন, বলা হয়ে গেছে। ফিরে যাওয়ার জন্য তাড়া দিতে লাগলেন তিনি।

৩৯. মরার পর ফতে আলির কেউ চোখ বুজিয়ে দেয়নি।

আবার ঘাড়ে করে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া হল ফতে আলিকে। ফতে আলিকে বিছানায় শুইয়ে দেওয়া হল। ফতে আলির নীরব দৃষ্টি। কোনো কথাও বলছেন না।

রহমত মুখের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে বলল, 'কাছে পেয়েও বললে না কেন? কেন অনুরোধ করলে না।'

ফতে আলি চুপ করে পড়ে আছেন। কোনো কথা বলছেন না।

'এত কষ্ট করে নিয়ে গেলাম কেন তাহলে তোমাকে? বোবা হয়ে থাকবার জন্য?'

ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকেন ফতে আলি। পাশে এসে দাঁড়িয়েছে নাতি রাহাত।

'বেঁচে থেকে তো সবার হাড়মাস জ্বালাচ্ছ, একটা উপকার করতে পার না?

একটা কথা বলতে তাতে তো পয়সা খরচ হত না। না মরে এখনও ঘাড়ে চেপে আছে।'

রাহাতের মা এসে বলল, 'বলবে কেন, তাহলে উপকার হয় যে। এখনও গু মুত কাড়ছি। বে-ইনসাফি লোক। মরলে হাড় জুড়োয়। কী জান বাবা, কত সাত ছোটোরা পট পট করে মরে যাচ্ছে, এ ঠিক টিক টিক করে বেঁচে আছে।'

'আব্বুজি, একবার তোমার নাতিটার কথা ভাবলে না?'

হাঁ করে চোখ স্থির করে আছেন ফতে আলি।

'শুধু দুটো কথা বলে অনুরোধ করতে। আবার যাবে, নিয়ে যাব কাল?'

ফতে আলি তেমনই নীবব। নিশ্চয় যাওয়া-আসার ধকলে কাহিল হয়ে পড়েছেন।

'একদম নেমোখারাম তুমি।'

বাহাতের মা বলল, 'এখনও ডাক্তার ওষুধ লাগছে। এখনও কন্না করতে হচ্ছে। এখনও খেতে দিতে হচ্ছে।'

ফতে আলি তেমনই নীরব। এবার ধীরে ধীরে শ্বাস নিতে লাগলেন। হেঁচকি শুরু হল।

বহমত বলল, 'আব্বাজি, কাল যাবে তো?'

রাহাতের মা বলল, 'কথা বলছে না কেন? দেখি তো' — কাছে এসে মুখ বাড়ায়। 'ও রাহাতের বাপ, এ তো দেখছি জাকানদানি শুরু হয়ে গেছে। মালেকুল মউত আব্বাজির শুরু হয়ে গেছে। ডাকো গো সকলকে।'

সত্যি সত্যি ফতে আলির শিয়রে মৃত্যু এসেছে। মুহূর্তে বাড়ির লোক পাড়ার লোকের কাছে খবরটা পৌঁছে যায়। সবাই নুয়ে পড়ে তাঁর মুখের কাছে। চামচে করে জল খাওয়ায়। কে যেন ফতে আলিকে কলমা পড়াতে চায়। আল্লা রসুলকে ডাকতে বলে। এক নাতনি এসে মাথার কাছে উঠে রেহেলে কোরান রেখে পড়তে থাকে।

মুহূর্তে আজই যে ফতে আলির মৃত্যু ঘনিয়ে আসবে কেউ ভাবতে পারেনি। সবাই তাঁর মৃত্যু কামনা করেছিল, কিন্তু মানুষটা বেঁচেই ছিলেন, এতদিন মৃত্যু তাঁর আসেনি। বাড়ির লোকে খুশিও। কষ্ট করে বেঁচে থাকার কোনো মানে হয় না। ওষুধ পথ্য ডাক্তারের খরচ। গু মুত সাফ করা। সবাই হারিপারি হয়ে পড়েছিল। তাছাড়া একটা ঘর দখল করে রেখেছিলেন। এখন মরে গেলে অনেক সুবিধে হবে।

কেউ কেউ নারী মাথার কাছে বসে অশ্রুপাত করছিল। মেয়েদের বাড়ি বাড়ি খবর চলে গেছে ফোনে ফোনে। মরেনি, মরছে। অবস্থা ভালো নয়।

কে যেন কলমা পড়াচ্ছিল ফতে আলিকে। ফতে আলিও ঠোঁট নাড়ছেন। বোধহয় কলমা পড়ছেন। আর মাঝে হেঁচকি তুলছেন। শ্বাস নিচ্ছেন অনেক পরে পরে।

কান্নার সুরে নাতনি সুরাইয়া কোরান পাঠ করে চলেছে।

পাড়া ভেঙে পড়েছে ফতে আলির মউত দেখতে। লোকজন কাজে যাওয়া বন্ধ করেছে। কেউ কাজ থেকে ফিরেও এসেছে। ফতে আলি একটু একটু করে মরছেন। ঠিক বেলা একটার সময় মারা গেলেন।

রাহাত তার মোবাইলে খবরটা পৌঁছে দিল আত্মীয়দের বাড়ি। ফতে আলির মেয়েরা এসেছে, নাতি নাতনিরা এসেছে। তারা ডাক ছেড়ে কাঁদছে।

একদল মেয়ে বউড়ি ঝিউড়ি গোসল করে ওজু করে কোরান পাঠ করছে। ফতে আলির ওপর একটা সাদা চাদর ঢাকা দেওয়া হয়েছে।

বাহাতের ফোনে কল এল সাহিলের। মৃত্যুর খবর সাহিল পেয়েছে। জানিয়ে দিল কাফন-দাফনের খরচ সে করতে চায়। এমনকি কুল পড়ানো খতমের খরচও করতে চায়। পাঁচ হাজার টাকা পাঠিয়ে দিচ্ছে সে।

কথাটা রটে গেল পাড়া প্রতিবেশীর মধ্যে। সাহিলের সুনাম হল। আসরবাদ কবরস্থ করা হবে। সেই সময় সাহিল আসবে। ফতে আলি তার দাদা ছিল না, দোস্ত ছিল। ফকিরপাড়ার সবচেয়ে প্রবীণ মানুষ তিনি আজ চলে গেলেন। সজ্ঞানে ইন্তেকাল করলেন।

কবর খোঁড়া চলছে। বাঁশ কাটা চলছে। ফতে আলির গোসল দেওয়ার আয়োজন চলছে। অনেকে শেষ দেখা দেখছে। এবং সেই সঙ্গে আত্মীয় স্বজনদের একযোগে কান্না চলছে। কেউ বলছে, মানুষটা মারা গেছে, বেঁচে গেছে। আবার কেউ বলছে, তবু মুরুব্বি লোকটা বেঁচে ছিল, মাথাব ওপর ছাতা ছিল। ছাতা সরে গেলে যা হয় তাই হবে। কেউ বলল এতদিন বেঁচে থাকতে নেই, তাবলে এ-ক-শো বছর!

মরার পরে কেউ ফতে আলির চোখ বুজিয়ে দেয়নি। তাই চোখ বন্ধ করানো যায়নি আর। মরার পরও তিনি চোখ চেয়ে আছেন। যেন মরার সময় শেষ নিশ্বাসটুকু গ্রহণ করতে করতে বিশ্বলোক দেখার মায়া ত্যাগ করতে পারেন নি।

একটু পরে সাহিলের টাকা আনল তার কর্মচারী। তারপর সাহিল এল আরও আধঘণ্টা পর। মুখ বাড়িয়ে ফতে আলিকে দেখল। ফোঁক ফোঁস করে কেঁদে ফেলল। আজই দেখা করতে গিয়েছিলেন তার সঙ্গে, ফিরে এসে মউত হয়। ফতে আলির জন্য অনেক কিছুই খরচ দেবে সাহিল, সে-সব ওয়াদার কথা জানাল। খানা দেবে। কবর বাঁধিয়ে দেবে। কুল পড়ানো, সবিনা খতম, মউতোখানা, এসব একাই বহন করবে। সবাই সাহিলের প্রশংসা করল।

ফাহমিদা জাসমিন এসে কোরানপাঠের দলে বসে কোরান পাঠ করছে। অপূর্ব এই ভঙ্গি। চমৎকার কণ্ঠে কোরান পাঠ করছে। কোন্‌খানে ফতে আলিকে কবরস্থ করা হবে, সাহিলকে একজন দেখিয়ে আনল। সে বিশিষ্ট ব্যক্তি। তার মান্যতা কত।

জানাজা হবে সেই আসরের নামাজের পরে। এখন গোসল দেওয়া হচ্ছে। কান্নারোল অনেকটা স্তিমিত হয়েছে। দূর দুরান্তের আত্মীয়-স্বজনরা এক এক করে আসছে।

সাহিল খুবই ব্যস্ত ছিল তার অফিসে। না এসে তার উপায় ছিল না। মনে মনে ভাবল, নেকির কাজ করতে আল্লা তাকে যেন আরও তৌফিক দেয়।

৪০. একটা ঘোড়া জোগাড় করতে পারবে?

সন্ধ্যা প্রায় হয় হয়। ছায়া নরম হয়ে এসেছে। চারপাশ ধূসর থেকে ধূসরতর হয়ে উঠেছে। গাছপালা ঝোপঝাড় কাজলের মতো গাঢ় হয়ে উঠছে। রিজি ভিখারিনি যেই ঘাটে পৌঁছল, সন্ধ্যা যেন নিজেকে খানিকটা ঝাঁকিয়ে নিয়ে আরও গভীর হল। ঘাটে এসে রিজি খুঁজল বালককে। বালকই তার অপেক্ষায় প্রতিদিন দাঁড়িয়ে থাকে। আজ এসে দেখতে পেল না। ইতি উতি তাকাল। নেই। অপেক্ষা করল, যদি গাছগাছালির আড়াল থেকে বেরিয়ে আসে। তারপর সুর করে ডাকল, 'আয় তো রে মোর বালক ভাই! মধু, ওরে মধু!' এমন ডাক শুনলে যতই মধু লুকিয়ে থাকুক না কেন, ঠিক বেরিয়ে আসত। গেল কোথায় ছোঁড়াটা? উদ্বেগ এল রিজির। মধুর জন্য মন কেমন করে উঠল। আজ কি বালকভাইয়ের সঙ্গে দেখা হবে না? সকালে দেখা হল, সন্ধ্যায় দেখা হবে না?

ঘাটের একটু তফাতে বালকের সঙ্গে দেখা হয় তার। কেউ কোথাও নেই, একাই দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছিল রিজি। ঝিঁঝি ও পাখির ডাক শুনতে পেল। তারপর মনে পড়ল, তার কাছে তো হিরে রেখে গিয়েছিল, হিরেটা তো ফিরিয়ে দেবার কথা। ছোটো ছেলে, কোথায় ফেলে রাখবে, কার হাতে পড়বে। কেউ হয়তো কদর করবে না হিরের টুকরোটার, এই জন্য তার বেশি দুশ্চিন্তা হয়। কেউ যদি নেয়, তার জন্য তো অপেক্ষা করে আছে, দিয়ে দেবে। হিরে তার কী প্রয়োজন? সে ভিক্ষে করে খায়। হিরে রাখার মতো আছে নাকি তার ঘরবাড়ি?

'দিদি — দিদি —' দূর থেকে হাঁক ভেসে এল।

ওই আসছে বালকভাই, রিজি হেসে উঠল।

দৌড়ে এসে রিজির কাছে থামল বালক। 'দিদি তোমার হিরে নিয়ে সমস্যা হয়েছে। এই নাও তোমার হিরে। আর কোনোদিন রাখতে পারব না।'

হিরে ফিরিয়ে নিয়ে রিজি আঁচলে গিঁট দিয়ে নেয়। 'কী হয়েছে?'

'আমাকে মেরেছে মনিবের ভাইটা।'

'কেন?'

'আমার গামছা টেনে কী আছে শুধু দেখতে চায়। আমি দেখতে দিইনি, সেজন্য

মেরেছে আমাকে। আমার গামছায় হিরে রাখা ঠিক হবে না আর।'

'তুই দেখতে দিলি না কেন?'

'দেখাই আর লোভ হয়।'

'হিরে চিনতে পারত কি না দেখতিস। বলত ঝুটো পাথর।'

'যদি নিয়ে নিত?'

'নিতে চাইলে নিত, আমি কিছু মনে করতাম না।'

'আর কক্ষনো তোমার হিরে গচ্ছিত রাখতে পারব না।'

'ঠিক আছে, আমার কাছেই থাকবে।'

'ঝগড়াতে দেরি হয়ে গেল। ভাবলাম তুমি চলে গেছ।'

'তোর সঙ্গে দেখা না করে কবে গেছি?'

'আমি যদি সেই গল্পটার মতো হতে পারতাম। সেই যে মায়ের কাছে রুটি নিয়ে রাজবাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা হল। এক ঝাঁক পিঁপড়েকে রুটির টুকরো দিল। নদীর মাছ ডাঙায় উঠে যেতে দেখে তাকে নদীতে ছেড়ে দিল। দুই বেঁটে লোক অকারণে মারামারি করছিল, তাদের থামাল। আমি যদি তেমন গল্পের বালক হতাম, রাজার মেয়ের অসাধ্য কাজ করে দেখাতে পারতাম। আর পেতাম অর্ধেক রাজত্ব ও রাজকন্যা।'

রিজি হেসে ওঠে। তার হাসি অন্ধকারে যেন ঝিলিক দিল। 'তোকে এসব গল্প কে বলে রে?

'আমার বিধবা মা।'

রিজি বালকের মাথায় কপালে বুকে পিঠে হাত বুলিয়ে দিয়ে আদর করে।

বালক বলল 'তোমার দেরি হয়ে গেছে; তোমাকে বোধহয় আর নিয়ে যাবে না সাজু মাঝি।'

'না রে, দূরছাই করে বটে কিন্তু ভালোইবাসে।'

'তুমি জেনেছ?'

'জেনেছি।'

'তোমাকে যা তা করে দেখে সাজু মাঝির ওপর আমার খুব রাগ হয়।'

'না রে, অনেক ভাষা তুই জানিস না।'

'যা বলে তা থেকেই তো বলছি।'

'ভাষা এক, কিন্তু সব মানে এক নয়।'

'যাও, আরও দেরি হয়ে যাবে।'

'তুইও সাবধানে ফিরে যা।'

বালক ফিরে গেল।

রিজিও ঘাটে নেমে এল।

অন্ধকারে নৌকার ওপর সাজু মাঝি ভরাটি আবেগদীপ্ত কণ্ঠে বলে উঠল, 'এত কী অপেক্ষা সয়!'

'সাজু মাঝি, আমি তোমার মনের রূপ জানি।'

'আমি ভালোবাসার কথা বলতে বাধা পাই, মনে যদি হয় বানানো?'

'রিজি ভিখারিনি জানে, তাকে কত ভালোবাসো, ভাষায় আশ্রয় নিলে তবেই বুঝব?'

'তুমি খুব সুন্দরী। তোমার রূপ চিনেছি। মনে হয় তোমার সঙ্গে যদি একসঙ্গে ভিক্ষে করতে যেতাম।'

কোনো কথা বলতে পারে না আর রিজি। আনন্দে তার কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে ওঠে। এই আনন্দ সে রাখবে কোথায়? তার যাত্রার সঙ্গী হতে চায় একজন পুরুষ, যে তাকে ভালোবাসেও।

সাজু মাঝি বলল, 'আমার কথার উত্তর পাইনি।'

ধরা গলায় বলল, 'আরও অপেক্ষা কর মাঝি। ভিখিরির পছন্দ যেমন থাকতে নেই, তেমনি অপেক্ষা হারিয়ে ফেলতে নেই।'

'কতদিন অপেক্ষা করব?'

'আপাতত এক বছব। একটা ঘোড়া জোগাড় করতে পারবে?'

'চেষ্টা করতে পারি।'

'আমি জানি তুমি পারবে। ততদিনে একটা ঘোড়া জোগাড় কর।'

'তুমি' —

'আমি একজন কোটিপতিকে ভিক্ষাগ্রহণ করতে বাধ্য করাব। তবেই'—

'সে কে?'

'তার কথা কোনোদিন আমার কাছে জানতে চাইবে না। তাহলে ভাতের থালার ভাত ফুল হয়ে উড়ে যাবে। গাছের ফুল পাথর হয়ে যাবে।'

'আর প্রতিজ্ঞা তোমার কী?'

'ঘরের বাইরে কোনোদিন ভালো পোশাকে থাকব না। একমাত্র ঘরের ভেতর বাড়ে ভালো পোশাক পরব। সাজবও।'

ঘাটে নৌকো ভিড়ালে অন্ধকারে নেমে পড়ে রিজি। রিজি বাড়ির পথ ধরে। তাদের আর কোনো কথা হয় না। আরও কথা তারা রাতে বলবে, আলাদা আলাদা ঘরে, আলাদা আলাদা বিছানায়, রাত জেগে, এই পৃথিবীর ভিতর।

৪১. ভিখারিনির প্রতি এত লোভ কেন?

ফাহমিদা বিছানায় শুয়ে পড়ল। তারপর আবার বিছানায় উঠে বসল। 'আজ আর ঘুমের ওষুধ খাব না।'

'কেন, ওষুধ খাবে না কেন?'

'আমি ঘুমোতে চাই না।'

'ডাক্তার কিন্তু বকবেন। তোমার মাথার যন্ত্রণা গেছে ঘুমের ওষুধ খেয়ে।'

'আর খেতে হবে না'

'সে কথা তো ডাক্তার বলবেন।'

'আমি ঘুমিয়ে পড়লে দুঃস্বপ্ন দেখি।'

বারান্দা থেকে সাহিলকে ডেকে আনে জাসমিন।

সাহিল দেখল ফাহমিদা বিছানায় বসে আছে। শুচ্ছে না, ঘুমোচ্ছে না, আগের দিনের মতো চুপচাপ শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ছে না। ওষুধ খায়নি।

ফাহমিদা বলল, 'আমার একটা কথা রাখবে? তুমি জাসমিনকে বিয়ে কর।'

'সে কথার জবাব পরে দিচ্ছি। আগে বল ওষুধ খাওনি কেন?

'তুমি আমার বিছানার পাশ থেকে উঠে যাও কি?'

'না, সারারাত শুয়ে থাকি তোমার পাশে।'

'আমার যেন মনে হয় তুমি থাক না। আমি অনেক সময় ঝিমিয়ে পড়ে থাকি, ঘুমোই না।'

'তোমার পাশেই ঘুমিয়ে থাকি আমি।'

'আমার রাত হলেই ভয় করে।'

'কেন।'

'ঘুমোতে হবে।'

'ঘুমোলে তো ভালো থাকবে, তোমার মাথার যন্ত্রণা যাবে।'

'আমি দুঃস্বপ্নের ভয়ে ঘুমোতে চাই না।'

'কীসের দুঃস্বপ্ন, আমি তো তোমার পাশে থাকব।'

'ভিখারিনিটা যখন এসে আমার পায়ে কামড় দেয়, তখন তুমি থাক না।'

'সে তো স্বপ্নে।'

'আমার সত্যি মনে হয়।'

'স্বপ্ন কখনো সত্যি হয় না।'

'আমি ওষুধ খাব না। তাহলে ঘুমিয়ে পড়ব। ঘুমিয়ে পড়লে দুঃস্বপ্ন দেখব।'

'আমি তোমাকে আগলে রাখব।'

'স্বপ্নের ভিতর থাকতে পাব কি?'

'থাকব থাকব, তুমি ওষুধটা খেয়ে নাও।'

জলের গ্লাস আর ওষুধ নিয়ে আসে জাসমিন। 'এই নাও, আমি খাইয়ে দিচ্ছি।'

ফাহমিদা দ্বিধা করে।

জাসমিন জোর করে খাওয়ানোর চেষ্টা করে।

শিশুর মতো ওষুধটা বাধ্য হয়ে খেয়েও নেয় ফাহমিদা।

ধরে ধরে সাহিল তাকে বিছানায় শুইয়ে দেয়। কপালে হাত বুলোয়। আলতোভাবে চোখের পাতায় অঙ্গুলি ঘষে। আঙুলের স্পর্শে বুঝতে পারল সাহিল ফাহমিদা ঘুমিয়ে পড়ছে। জাসমিন ঘরের বড়ো আলোটা নিবিয়ে দিয়ে ছোটো আলোটা জ্বেলে দেয়। শান্ত হয়ে বাধ্য শিশুর মতো ফাহমিদা ঘুমিয়ে পড়ে।

বাইরে বারান্দায় সাহিল আর জাসমিন দূরত্ব বজায় রেখে দাঁড়িয়ে থাকে বাইরের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে। তাদের মাঝখানে বয়ে চলে বিপুল নীরবতা। আর রাতের শব্দ। ফাহমিদা ঘুমিয়ে গেছে। এই নীরবতা যেন বেদনার সুর মূর্ছনা। নীরবতা জুড়ে বেজে চলেছে কোনো এক বেদনার সুর। ফাহমিদাকে ঘুম পাড়িয়ে দেওয়ার মধ্যে যেন কোনো ষড়যন্ত্র ছিল, ছিল কোনো রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের উপমা। আর সে ট্র্যাজিক রাজা নিজেকে প্রধান করে। নিজের দম্ভকে সে বাড়ায়, আরও বাড়ায়।

'আপনি কি সেই ভিখারিনিকে এখনও চান?'

সাহিল পাশ ফিরে জাসমিনকে দেখে। 'কেন একথা শুধোচ্ছো?'

'জানতে ইচ্ছে করল।'

'আমি তার সাক্ষাৎ পেতে চাই আর তার প্রেম পেতে চাই।'

'তার সঙ্গে কোনোদিন আপনার দেখা হয়নি?'

'না।'

'আপনার কি বহুগামিতায় লোভ?'

'আমার এক নারীত্বের প্রতিই লোভ।'

'তবে যে—'

'তোমার প্রশ্নের উত্তর দিতে আমি বাধ্য নই।'

'ধমকাচ্ছেন?'

'যদি বল তাই।'

'আপনি না কোটিপতি। আপনার এই অধঃপতন!'

'ভিখারিনি ধরে নাও কোনো গায়েবি কোনো কিছু! তবে'—

'তবে কি?'

'তবে সে ভিখারিনি। তার পার্থিব কিছু দেওয়ার নেই।'

'আমি আজ খিল দিয়ে শোব।'

'আমি একা হয়ে পড়ব।'

'আপনী লোভী মানুষ, অত্যাচারী মানুষ, প্রেমহীন মানুষ, বড়োবুবুর পাশে গিয়ে শোন গিয়ে।'

'আমাকে একা হতে বোলো না।'

'আগে বলুন কোনোদিন আপনার পক্ষে আমাকে বিয়ে করার সম্ভবনা আছে কি না? হ্যাঁ অথবা না।'

'হ্যাঁ।'

জাসমিন যেচে তার কাছে আসে সেই মুহূর্তে। সাহিল জাসমিনকে হাত দিয়ে সরিয়ে দিয়ে বলল, 'আমি যাই ফাহমিদার কাছে। ও দুঃস্বপ্ন দেখতে পারে।' তারপর ঢুকে পড়ে সে ঘরের ভিতর।

বাইরে তখন ডুকরে ওঠা কান্নার শব্দ।

৪২. রাখাল বালক রাজার সামনে গিয়ে উপস্থিত হল।

বালক মধুর সঙ্গে দেখা হল রিজির। কথাও হল। তারপর চিবুক ধরে আদরও করে দিল। আজ থেকে আর মধু হিরেটা রাখতে পারবে না। কেন না মনিবের ভাই তার গামছার খুঁটে কী বাঁধা দেখতে চায়। ওটা যে হিরে সে কথা মধু জানে। কিন্তু তাব মনিবের ভাই ঝুটো ভেবে যদি হিরের কদর করতে না পারে। সেই ভয়ে মধু হিরেটা আর গচ্ছিত নিতে চায় না।

রিজি ভিখারিনির দায়িত্ব পড়েছে আঁচলে হিরে নিয়ে ভিক্ষে করতে যাওয়ার। হিরেটা অবহেলায় আঁচলের খুঁটে বাঁধা থাকবে। সে ভিখারিনি, হিরে নিয়ে মশগুল থাকতে পারে না। কাঙালপনা নিয়েই ভিক্ষের জন্য দোরে দোরে ঘুরবে। চাল খুদ যা পাবে থলিতে ভরবে। পয়সাকড়ি যা পাবে আঁচলের অন্য খুঁটে বাঁধবে। হেঁটে হেঁটে অনেক দূর যাওয়ার ইচ্ছা। ইচ্ছে বাগনান শহরে যাওয়ার। আগেও গিয়েছে। বাগনানের এন ডি ব্লকে আজ ভিক্ষে মাগুবে।

হাঁটিতে লাগল সে। তার সঙ্গে চলতে লাগল গতকাল বালক মধুর বলা গল্পটা। যে গল্পতে এক রাখাল একটা রুটি নিয়ে অভিযানে বেরিয়েছিল। উদ্দেশ্য রাজবাড়ি। আর রাজকন্যার দুঃসাধ্য কাজ করে দিয়ে রাজকন্যা লাভের পণ নিয়ে বেরিয়েছে। পথে পড়ল পিঁপড়ের দল। তারা ক্ষুধার্ত। তাদের রুটির টুকরো দিল। তাদের সর্দার জানাল, কোনোদিন কোনো কাজে প্রয়োজন হলে যেন আমাদের ডাকা হয়। তারপর ডাঙায় উঠে পড়া এক মাছের সঙ্গে দেখা। মাছকে নদীতে ছেড়ে দিলে মাছও তার বিপদের দিনে উপকার করবে। তারপর দুজন বেঁটে লোক অকারণে নিজেদের মধ্যে মারামারি করছিল দেখে তাদের নিরস্ত করল রাখাল। বেঁটে লোক দুটো ভাবল সত্যিই তো অকারণে মারামারি করে নিজেরাই শেষ হয়ে যেত, এই রাখাল তাদের বাঁচিয়েছে। বিপদের সময় তারাও বালককে উপকার দেবে।

রাজকন্যা চাইছে তার তিনটি কঠিন কাজ যদি কেউ করে দেয় তবেই সে ব্যক্তির গলায় মালা দেবে আর অর্ধেক রাজত্ব হবে তার। এক রাতের মধ্যে কেউ যদি

বস্তা চালে চিনির মধ্যে এক বস্তা চিনি আলাদা করে দিতে পারে, আর নদীর গভীরে যে মুক্তো আছে এনে দিতে পারে, আর পাহাড়ের সরু গহ্বরের ভিতর যে হিরে আছে এনে দিতে পারে, তবেই তার গলায় মালা দেবে। না পারলে গর্দান যাবে।

রাখাল বালক রাজার সামনে গিয়ে উপস্থিত হল। বলল সে পাববে। রাজা তাকে নিরস্ত করতে চাইলেন। বালক জেদ ধরল। অগত্যা রাজাকে রাজি হতে হল। রাজকন্যা দেখে গেলেন সেই বালককে, পণমতো কাজ করতে হবে। না হলে গর্দান যাবে। কত রাজপুত্রের প্রাণ গেছে।

রাতের প্রথম প্রহরেই বালক ডাকল পিঁপড়ের সর্দারকে, চাল থেকে চিনি আলাদা করার জন্য। পিপঁড়ের সর্দার তার দলবল এনে কিছুক্ষণের মধ্যেই চাল থেকে চিনি আলাদা করে দিল। দ্বিতীয় প্রহরে গেল বালক নদী তীরে। সেই মাছকে বলল মুক্তো সংগ্রহ করে এনে দিতে। কিছুক্ষণ পরেই মাছ এনে দিল সেই মূল্যবান মুক্তো। তৃতীয় প্রহরে সেই বেঁটে লোকদুটোর কাছে গেল বালক। পাহাড়ের সরু গহ্বর থেকে হিবে আনতে বলল তাদের। তারা সাগ্রহে কাজটা করতে রাজি হল। তারা বেঁটে হওয়ার জন্য পাহাড়ের গহ্বরে স্বচ্ছন্দে ঢুকে গেল। আর হিরে সংগ্রহ করে দিল সেই রাখাল বালককে।

রাজবাড়ির অতিথিশালায় তখন রাখাল ঘুমিয়ে পড়েছিল। জল্লাদ এসে তার ঘুম ভাঙায়। জল্লাদকে দেখায় সে তিনটি কাজ করে ফেলেছে। জল্লাদের অবিশ্বাস্য মনে হল। মুহূর্তে রাজার কাছে খবর পৌঁছল, রাজকন্যাও জানলেন। দুজনেই ছুটে এলেন। দেখলেন সেই রাখাল বালক তিনটি কাজই করে ফেলেছে। রাজকন্যা বাধ্য হলেন সেই রাখাল বালকের গলায় বরমাল্য পবাতে।

রাখালের এই রাজকন্যা ও রাজত্ব পাওয়ার গল্পটা খুব পছন্দ রিজির।

তেমনি কোটিপতির ভিখিরি প্রবৃত্তিকে পছন্দ করে। ভিখারিনির ভবিষ্যদ্বাণীতেই তো রাজকন্যার সঙ্গে আর এক মৃত রাজকুমারের বিয়ে হয়েছিল। সে গল্পটাও বেশ। রিজি ভিখারিনি যখন ভিক্ষার উদ্দেশ্যে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে যায়, তখন তার মনে চলতে থাকে কোনো রূপকথার গল্প। তাতে তার পথশ্রম লাঘব হয়। আর সে ভিখারিনি বলে রাজপুত্র রাজকন্যা এই গল্প তার ভালো লাগে। সে স্বপ্নে বাঁচে। স্বপ্নে যদি কিছু খেতে হয় পোড়া রুটি খাবে কেন, পোলাও খাবে। গল্পভাবনাগুলো তার স্বপ্নেব সগোত্র।

পৌঁছে গেছে সে গাড়ি ঘোড়া দোকানপশারি লোকজনের ভিড়ের মধ্যে বাগনান শহরে। দোকানে দোকানেও সে ভিক্ষে কবতে পারে। কিন্তু গৃহস্থের বাড়িতে ভিক্ষে করতে তার বেশি ভালো লাগে। গৃহস্থের লোক ভিক্ষে দিতে দেরি করলে দরজার সামনে বসে পড়া যায়। একটু জিরিয়ে নিলে আবার হাঁটতে পারা যাবে। তাছাড়া

গৃহস্থ বাড়ির ভিতর যে টুকরো টাকরা কথোপকথন শুনতে পায়, তার মধ্যে মায়া আছে। সেই সব কথাবার্তায় সংসারিকতার সুধা মাখা থাকে। শিশুর চিৎকার অথবা কান্না, অথবা মায়ের আর্তি আবেগ শুনতে বেশ ভালো লাগে। ভালো লাগে প্রিয় সম্বোধন শুনতে। সুখানুভূতির নানা শব্দ গন্ধ রং শোনা যায় দেখা যায়, অনুভব করা যায়। এসব দোকানদানিতে গেলে পাওয়া যায় না। তাই সে গেরস্ত বাড়িতে ভিক্ষে করতে পছন্দ করে।

কোনো এক জায়গায় ভিক্ষে করতে পর পর দিন যাওয়া যায় না। যেতে নেই। গেরস্ত বাড়ির লোকজন বিরক্ত হয়। কিছুদিন পর গেলে, অনেক দিন না দেখার আবেগও তৈরি হয় তাদের মধ্যে, ভালোবাসাও জমে।

কেউ বেশি দেয়, কেউ কম দেয়। কম যে দেয় তার প্রতি অসন্তোষ জানাতে নেই। সবই শোকর করতে হয়। কেউ ভিক্ষে দিয়েই থাকে না। ভিখারিকে সবুর সন্তুষ্ট থাকতে হয়। রাগ না করে বিনয় দেখাতে হয়। দাতারা রাগ আর অসন্তুষ্টি একেবারে পছন্দ করে না। আব আল্লা রসূলের নাম মুখে নিতে হবে। চাওয়ারও নিয়ম আছে, বেশি কিছু চাইতে নেই। বেশি যে দেবে নিজে হাতে দেবে। তার হাতের মুঠির মধ্যে তার দৈন্য ও স্বভাব উঠে আসবে। ভিখিরিরা অনেক ধরনের মানুষ চেনে। অনেক জনসংযোগে থাকে সে।

হাঁটিতে হাঁটিতে সে পৌঁছে যায় বাগনানের এন ডি ব্লকে।

৪৩. বউটি যে শাড়িটি পরে আছে, তাও সুন্দর।

এক গেরস্ত বাড়ির দরজার সামনে দাঁড়িয়ে বলল, 'মাগো খয়রাত দেবে। লা ইলাহা ইল্লাললাহ্ মহামমদুর রসূলুল্লাহ্।'

দরজা খুলে দাঁড়াল এক কমবয়সী বউ, 'ওমা, তুমি? কতদিন পরে এসেছ গো। আজ খেতে পারবে আমাদের বাড়ি?'

'হ্যাঁ।'

'আমার কিন্তু রান্না হয়ে গেছে।'

'এত সকালে?'

'ঘুম থেকে উঠে মনস্থ কবেছিলাম মিশকিন খাওয়াব। তাই সকাল সকাল রান্না। ভোর রাতে শাশুড়িকে স্বপ্ন দেখলাম। যেন আমার হাতে খেতে চাইছে। এক বছর হল মারা গেছে। খেতে তো পারত না। গলায় ক্যানসার হয়েছিল।'

'আহা, আল্লা তাকে জান্নাতবাসী করুক।'

'তোমাকে কিন্তু পাঁচটা টাকাও দেব। যাবার সময় মনে করিয়ে দেবে।'

'আল্লা তোমাদের জান সালামতে রাখুক।'

'এখনই খেতে পারবে তো?'

'হ্যাঁ, বেলা দশটা হয়ে গেছে।'

'বাড়িতে আর কেউ নেই, তুমি ভেতরে এসো দেখি। তোমাকে খাইয়ে দিই। সকাল সকাল তোমার দেখা পেলাম। ভাবনা হচ্ছিল কোনো মিশকিন না আসে। তাহলে আমার সাধ পূরণ হত না। তুমি এসে আমার মুখরক্ষা করেছ।'

খাবার ঘরে মাদুর পেতে দেয় বউটি। পাখা চালিয়ে দেয়।

রিজি বলল, 'তোমার স্বামী কী করে বোন?'

'সোনার কারিগর। মুম্বাইয়ে থাকে।'

'তোমার বাপের বাড়ি কোথায়?'

'নদীপার, ভাটোরা'

'ওমা সেখানে তো বন্যা হয়েছিল এবছরও।'

'প্রতি বছরই বন্যা হয়। হাজা দেশ। ডোঙা চড়তে আমিও পারি।'

'ভাইবোন?'

'সবাই ছোটো। পড়ছে। আমি বড়ো, আমার বিয়ে হয়ে গেল।'

'আহা, স্বামীও থাকে না।'

অনেকগুলি পদ দিয়ে খেতে দেয় বউটি। হাতের রান্নাটিও বেশ। সবকিছু বেশি বেশি করে দিচ্ছে। মেয়েটির মন উদার। আর কাউকে হীন ভাবে না। হাসিটিও মিষ্টি। দেখতেও ভালো। সম্পন্নতা সচ্ছলতা আছে। ঘরদোরও পরিপাটি। শহরের মানুষ। সবকিছু সাফসুতরো। বউটি যে শাড়িটি পরে আছে, তাও সুন্দর। সুখী, সোহাগী বউ। শাশুড়ির মৃত্যুতে কষ্ট পেয়েছে। বোধহয় একাও। ভিখিরির সঙ্গে সময় কাটাচ্ছে। মন খুলে কথাও বলছে। ঠোঁটের নীচে একটা তিল আছে। একটু বেঁটে গোছের। কপাল উদাস, চুল বেশি।

খাওয়া হয়ে যাওয়ার পর নতুন বাড়ির ভেতরটা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখাচ্ছিল। আলমারি বক্স-ফিটিং খাট দেখাচ্ছিল। দেখাচ্ছিল টি-ভি ভিসিডি টেপ রেকর্ডার টোস্টার মেশিন আরও কতকিছু। যা সব কোনোদিন দেখেনি রিজি।

'দাঁড়াও তোমাকে কিছু চাল দিই।'

এক কিলো মতো চালই দিয়ে দিল।

একসময় গায়ে হাত দিয়ে বলল, 'বা, তুমিও তো খুব সুন্দরী!'

বউটির চোখে পড়েছে সে সুন্দরী। তার মানে তাকে অবহেলার চোখে দেখেনি। বউটি উদার শুধু নয়, পরশ্রীকাতরও নয়।

এবার ফিরে যাওয়ার পালা। দরজার বাইরে পর্যন্ত এগিয়ে দেয় বউটি।

রিজি বলল, 'ও বোন, পাঁচটা টাকা! তুমি মনে করাতে বলেছিলে বলে বললাম।'

'এই দেখ আমার কেমন ভুলো মন। তোমাকে সে জন্য মনে করতে বলেছিলাম'

আঁচলেই বাঁধা ছিল টাকা। আঁচলের গিঁট খুলে দেয় রিজিকে।

রিজি আরও একবার আল্লা রসুলকে ডাকে। দোওয়া করে।

বিদায় নিয়ে বেরিয়ে পড়ে রিজি।

পেছন থেকে বউটি বলে, 'আবার এসো কিন্তু।'

রিজি মাথা নামিয়ে হ্যাঁ জানায়।

তারপর রিজি চলতে থাকে। গেরস্ত বাড়ির ভেতরে ভেতরে যায়। এক একটা গেরস্ত বাড়ির ভেতর থেকে এক এক রকম সুগন্ধ বেরিয়ে আসে। সুগন্ধের বিভিন্নতা বুঝতে পারে রিজি। মানুষ নানা স্বরে ও সজ্জায় আছে। সবাই সুখ সন্ধান করছে, শান্তিতে থাকতে চাইছে। এই গন্ধগুলোর মধ্যে শত্রুতা , নীচতা নেই। এগুলো বাড়ি, বিশ্রামস্থল। দোরে দোরে ঘুরে রিজি সুখের স্পর্শ নিয়ে যায়। এমনি করে গ্রাম-গ্রামান্তরে যায়। এমনি করে হাট ঘাট শশ্মান গোরস্থান নদী নালা পেরিয়ে চলেছে সে, উদ্দেশ্য তার জনপদ। তার পূর্বপুরুষের ঘোড়া ছিল, তার নেই। সে একজন সহমতকামী পুরুষ চায় ও ঘোড়া চায়।

সে এই পথশ্রমের জন্য ক্লান্ত হয় না। নতুন করে সকাল হলে নতুন করে উৎসাহ পায় পথ চলার। ঘোড়া আর পুরুষ থাকলে পৌঁছে যেত নিত্যনতুন জনপদে। বার্তা দিত দীনতা বিনয়ের দর্শন। তার জীবনই দর্শন। আলো কখনো নিজেকে আলোকিত করে না, আধার উপচে পড়ে। সে আলোর উৎস হতে চায়। তার আঁচলে দুটি খুঁট। একটিতে ভিক্ষের কড়ি বাঁধে। অন্য খুঁটে আছে তার বহুমূল্যবান হিরেটি। সে সারাক্ষণই ভুলে থাকে হিরেটার অস্তিত্ব। সে হিরে নিয়ে বাঁচে না, তার কোনো কাজে লাগে না। ভিক্ষের কড়ি তার কাজে লাগে। তার গ্রাসাচ্ছাদন তাতে মেটে। হিরেটিকে রক্ষা করে যায় শুধু বংশ ইতিহাস ঐতিহ্যের মতো, ভোগ করে না কখনো। কারও কাজে লাগে যদি তাকে নির্দ্ধিধায় হিরেটা দিয়ে দিতে পারবে। কেউ তার কাছ থেকে কিছু যদি চায়, হিরে দিতে কসুর করবে না।

ঘুরে ঘুরে ভিক্ষা মাঙে এন ডি ব্লকের ভিতর। ভিক্ষের জন্য দরজার বাইরে কতক্ষণ যে অপেক্ষা করতে হয়! কখনো ঘরের মানুষের কাছে পৌঁছয় না ভিক্ষাপ্রার্থী দরজায় এসে দাঁড়িয়েছে। বারবার ডাক দিতে হত। কেউ শুনেও শোনে না। যে বেরিয়ে আসে সে শুধু ভিক্ষা নিয়ে বেরিয়ে আসে না, নতুন মুখ নিয়ে বেরিয়ে আসে। আর এক মুখের সঙ্গে দেখা হয়। নতুন নতুন মুখ দেখার ভিতর কত সুখ, কত কত আনন্দসুধা।

ওরা সবাই তাকে দীন দরিদ্র ভাবে। অবজ্ঞা অবহেলাও করে। ওদের দম্ভ অহংকারকে ক্ষমা করে সে। সে কোনো অহংকার করতে জানে না। তার ঐতিহ্যই অহংকার। অহংকারী সে তার দর্শনে। অনেকে তো পুণ্য অর্জন করতে ভিখিরিকে

দান খয়রাত করে। তার বৃত্তির মধ্যে ঈশ্বরের ইচ্ছা আছে, নির্দেশও আছে। আল্লাকে খুশি করা যায় তাকে খুশি করলে। তাকে শূন্য হাতে ফিরিয়ে দিলে আল্লা অসন্তুষ্ট হয়। তার মুখে তাই আল্লা রসুলের বাণী থাকে। সেই বাণীর সে বার্তাবহ। হাঁটছে সে হাঁটছে, ভিক্ষার জন্য দোরে দোরে।

৪৩. শুধু ভিক্ষে নাও, কোনওদিন ভিক্ষে দিয়েছ?

কয়েকটি ফ্ল্যাটেব কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে। ফ্ল্যাটের মালিকরা মালপত্রও নিয়ে চলে এসেছে। পাম্প চালানো হয়েছে, জলের সরবরাহ হয়েছে। দু-একটা ফ্ল্যাটে আজও টুকটাক কাজ হচ্ছে। পরেও হবে। সে-সব দিকে তাকালে চলবে না সাহিলের। এখন বেলা একটা বাজে। ফ্ল্যাটেব গেটের সামনে ডেকরেটরের লোকরা এখনও গেট বানাচ্ছে। তার কাজ শেষ হওয়া চাই দুটোর মধ্যে। তিনটেয় উদ্‌বোধন। বারোটার সময় জাসমিন চলে এসেছে। গাড়ি পাঠিয়েছিল। পরে গাড়ি যাবে ফাহমিদা আর ছেলেমেয়েদের আনতে। নীচের দোকানগুলো দোকানের মালিকরা সাজাচ্ছে। মাইক এসে গেছে। মাইকে বাজছে রবীন্দ্রসংগীত। 'জগতের এই আনন্দযজ্ঞে'.....সব ফ্ল্যাট বিক্রি হয়ে গেছে। দোতলার একটি ন'শো স্কোয়ার ফুট ফ্ল্যাট বিক্রি করেনি। যদি নিজের কোনো প্রয়োজন হয়, রেখেছে। আর সেই ফ্ল্যাটেই আজ অতিথি-আপ্যায়ন করা হবে। তাদের বসার জন্য চেয়ার পাতা হয়েছে। ফুল দিয়ে সাজাচ্ছে এখনও ফুল দোকানের লোক। তারই তদারকি করছে জাসমিন। জাসমিন কখনও কখনও সাহিলের মতামত নিয়ে নিচ্ছে।

মাইকে বেজে উঠল, 'আমি জেনে শুনে বিষ করেছি পান'....সাহিলের দিকে জাসমিন তাকাল।

জাসমিন বলল, 'ফ্ল্যাটটা আমার, আমাদের।'

সাহিল বলল, 'বলছ!'

'বলছিই তো। বেশ কিন্তু। খাট আসবাব দিলে যা খুলবে না! আলাদাভাবে জানালা দরজাগুলো বানিয়েছ যে, আগে থেকে মতলব ছিল বুঝি!'

সাহিল কিছু বলল না।

'সব প্রশ্নে চুপ থাকলে চলবে না।'

'তোমার উচ্ছ্বাস দেখছি। আর একটা ফ্ল্যাটবাড়ি বানাব কিন্তু।'

'তখনও আমার, আমাদের আর-একটা ফ্ল্যাট হবে।'

'বেশ, বেশ। তুমি আজ এত সেজেছ যে?'

'মানিয়েছে?'

'খুব।'

'তবে একটা জিনিস পাওনা হচ্ছে এই মুহূর্তে।'

'কীসের?'

'আমার ঠোঁট কিছু চাইছে।'

সাহিল পাশ ফিরে দেখল ফুল সাজানোর লোক দুটি এখনও আছে। কাজ প্রায় শেষ করেই এনেছে। নিজেরও বাসনা হল। ঠোঁটে তর্জনী তুলে বলল, 'চুপ। সবুর!'

জাসমিন একটা সুন্দর হাসি দিল।

বেশ আক্রান্ত হওয়ার মতো জাসমিনের হাসি।

জাসমিন দরজা খুলে বাথরুম দেখে, রান্নাঘর দেখে। তিনটি ঘর আর ডাইনিং স্পেশ। একটু বারান্দাও আছে। একটা ঘর বড়ো, বারো বারো। ঘরগুলি বেলুন ফুল আর বাহারি রং বেরঙের কাগজের ফুল দিয়ে সাজানো হয়েছে। সেজে উঠেছে ফ্ল্যাটটি। চেয়ার আর টি-টেবিল সুসজ্জিতভাবে রাখা হয়েছে। জলের বোতল আছে, গ্লাস আছে। গৌর ক্যাটারার থেকে আসবে কফি আর বিরিয়ানির প্যাকেট। উদ্‌বোধন সংগীত গাইবে নন্দিতা বন্দ্যোপাধ্যায়। উদ্‌বোধন করবেন এম এল এ সবুজ মিত্র। ফুলের মালা, ফুলের তোড়াও এসে গেছে। একটু পরেই কর্মচারীরা এসে যাবে। সে সব সামলাবে তারা। মাইকে ঘোষণা করবে ম্যানেজার নিশার।

ফাহমিদা ছেলেমেয়েদের আসতে আড়াইটে বেজে যাবে। তা বাজুক। তিনটেয় তো উদ্‌বোধন। সভাপতি ও অতিথিদের গলায় মালা পরাবে ফরিদ আর আনিসা। সকলকে ধন্যবাদ দিয়ে দু-চার কথা বলবে সাহিল। সে কি আর করেছে, আপনাদের কাছে আমি নগণ্য মানুষমাত্র। যদি বলেন, হ্যাঁ মধ্যবিত্তের চাহিদা বুঝেছি। তাঁরা বাগনানের বুকে ফ্ল্যাট চাইছিলেন। আমি সাধারণ মানুষ। আপনাদের পাশে বসবার যোগ্যতা আমার নেই। আপনাদের সস্নেহ দৃষ্টি পাই বলেই এইটুকু কাজ আমি করতে পেরেছি। আপনাদের ধন্যবাদ, আপনাদের মূল্যবান সময় ব্যয় করে এখানে এসেছেন। আপনাদের কাছে আমার কৃতজ্ঞতা জানাই। ধন্যবাদ, আসসালামো আলাইকুম। নিশ্চিত হাততালি পড়বে।

ফুল সাজানোর লোক কাজ সেরে চলে গেছে।

জাসমিন দরজায় ছিটকিনি এঁটে দিয়ে সাহিলের মুখোমুখি এসে দাঁড়ায়। একেবারে স্পর্শের কাছে চলে যেতে চায়। সাহিল কাছে টেনে চুম্বন দিতে গিয়েছিল যেই অমনি দরজায় কড়া নাড়ল কে। কড়া নাড়ার পরও চুম্বন দিতে গেল। আবার কড়া নাড়াল, কে বিরক্ত করে মারল? কর্মচারীরা বার বার দরজায় কড়া নাড়িয়ে বেয়াদবি করবে না। নিশ্চয় অন্য কেউ।

জাসমিন খুলতে যাচ্ছিল।

সাহিল বলল, 'দাঁড়াও তো দেখি কে?' টান মেরে দরজা খুলে ফেলে। এক

ভিখারিনি দাঁড়িয়ে আছে। সাহিলের মাথায় রক্ত চড়ে যায়।

'বাবু ভিক্ষে দেবেন?'

'তোমার মতো মেয়ে খেটে খাও না কেন, ভিক্ষে করে খাও?'

'বাবু ভিক্ষে করেই থাকি।'

জাসমিন সাহিলকে নিরস্ত করার ভঙ্গিতে বলল, 'আহ্, কিছু ভিক্ষে দিয়ে ছেড়ে দাও না। দেখছ না কেমন নোংরা পোশাক।'

'এদের ভিক্ষে দিলে এরা আরও আস্কারা পায়। ও মেয়ে, ভিক্ষে ছাড়া তোমার অন্য কোনো কাজ নেই?'

'না। ভিক্ষে চেয়েই বেড়াই।'

'শুধু ভিক্ষে নাও, কোনোদিন তুমি ভিক্ষে দিয়েছ?'

'না।'

'দাও দিকি আমাকে ভিক্ষা।'

ভিখারিনি সঙ্গে সঙ্গে আঁচলের গিঁট খোলে। ছোট্ট কাগজে মোড়া কি একটা সাহিলের হাতে দিয়ে দেয়।

সেই মুহূর্তে সাহিলের ফোন আসে। কাগজের তুচ্ছ মোড়কটা তুলে দেয় জাসমিনের হাতে। নিশারের সঙ্গে ফোনে কথা বলে। ভিখারিনি নেমে গেছে নীচে। পাগল! দরজা বন্ধ করে দেয় সাহিল। যত্ত সব!

জাসমিন কাগজের মোড়কটা জানালা দিয়ে ফেলে দেবে কি না ভাবল। তারপর কী ভেবে সেটা খুলে দেখে। পাথরের মতো কিছু যেন।

সাহিল বলল, 'কী, দেখছ কী অমন করে?'

'ভিখারিনিটা আপনাকে একটা হিরে ভিক্ষে দিয়ে গেল।'

সাহিল আকাশ থেকে পড়ল। 'জাসমিন আমার সর্বনাশ হয়ে গেছে। সেই ভিখারিনি যার খোঁজে আমি গ্রাম-গ্রামান্তরে খুঁজে বেড়িয়েছি, সে আমাকে ভিক্ষে দিয়ে গেল, আমি তাকে চিনতে পারিনি। আমার সর্বনাশ হল, আমাকে ফকিরপাড়া ছাড়তে হবে, দ্বিতীয় বিয়ে করতে হবে।'

খিল খিল করে হেসে ওঠে জাসমিন। 'আপনি তো সেদিকেই এগিয়েছেন।'

'তুমি হিরে চেনো?'

'একেবারে খাঁটি হিরে। বহু মূল্যবান।'

'জ্যোতিষীর ভবিষ্যদ্বাণী ফলে গেছে। আমার সর্বনাশ হল!'

'আপনার এই সেই ভিখারিনি? ছিঃ!'

'তুমি সে রূপ দেখনি।'

'ও সব ভুলে যান। মনের ভুল।'

'ভুলে তো যেতেই হবে।'

জাসমিন ঘুরিয়ে ফিরিয়ে হিরেটা দেখছে সত্যিই কি হিরেটা বহু মূল্যবান? দেখতে লোভ হল সাহিলের। জাসমিনের হাত থেকে হিরেটা নেয়। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে। ধীরে ধীরে হিরের প্রতি লোভ জন্মাতে থাকে তার।

৪৪. অন্তিম কথা।

গল্পটা এখানেই শেষ করা যেত। কিন্তু রিজি ভিখারিনি ভিখারিনির বেশে সত্যিকারের ভিখিরিকে তার হিরেটা ভিক্ষে দিয়ে এসেছে। তারও কিছু খায়েশ আছে। কেন না সে তো রূপকথার নায়িকা। সে যখন ভিক্ষে নেয় খুদ কুঁড়ো নেয়। সে যখন ভিক্ষে দেয় হিরে দেয়। রূপকথায় এই অপরূপ কথা গড়ে দিলেই তার ছুটি হত। কিন্তু সেই যে সাজু মাঝির প্রেমে পড়েছে? তাকে তো এক বছর অপেক্ষায় রাখতে চেয়েছিল। তার কাছে যে একটা ঘোড়া চেয়েছিল। তার কী হবে? সেই গল্পটা কোথায় ঘটবে? সেই পরিণতির জন্য আবার কলম ধরতে হল। রিজি ভিখারিনি নিশ্চিন্ত, হিরেটার মোহ তার শেষ হয়েছে। সাজু মাঝির কাছে সে ফিরে যেতে চাইল। পুরুষ-হিরের জন্য সে ব্যাকুল হল। সন্ধ্যায় ফিরতে লাগল সে ঘাটে। গাছগাছালিতে পাখিদের কলকাকলির ভিতর তার সঙ্গে দেখা হবে। সে একদিন তার জন্য নিয়ে আসবে একটা ঘোড়া। তার বিনয় ও দীনতার সঙ্গী হতে চেয়েছে সাজু মাঝি। তার ভিক্ষা দর্শনে সে সঙ্গী হবে। বিনয় ও দীনতার বার্তা নিয়ে গ্রাম থেকে গ্রামান্তর যাবে। একদিন তাদের ঘোড়া হবে। তখন দেশ থেকে দেশান্তর চলে যাবে। সে কাহিনি অন্য একদিন।